কল্কি
ও
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প

কল্কি
ও
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের
গল্প

রচনা
চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স

কল্কি ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প
চিত্তরঞ্জন ঘোষাল

প্রথম প্রকাশ
মে, ২০০৫

© প্রকাশক

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
বিজয় চন্দ্র রায়
জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
২/২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা
মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা
ISBN 984-609-011-0

প্রকাশকের কথা

'পুরাণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পুরাতন' হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয় চিরনুতন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইতিহাস, আখ্যান, লোককথা, ধর্মালোচনা, সমাজবিধি, দেবমাহাত্ম্য ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সমন্বিত করে যে মিশ্ররূপসম্পন্ন গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছে তাদেরকেই পুরাণ বলা হয়। পুরাণ হলো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এমন কিছু আচার-আচারণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস যা মানুষের রক্তের মাধ্যমে নদীর মতো প্রবাহিত হচ্ছে এবং যা মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে নির্বিঘ্নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কী কী লক্ষণ থাকলে আমরা তাকে পুরাণ বলব? সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পাঁচটি লক্ষণ যে বইগুলোতে আছে তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী বিচারে পুরাণ বলে চিহ্নিত করা হয়।

পুরাণ সম্পর্কে অথর্ববেদে, শতপথ ও গোপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েকটি গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে এবং বিশেষত মহাভারতে অনেক ব্যাখ্যান করা হয়েছে। আর সেই সবের অনুসারে ২৮টি মহাপুরাণ এবং অনেক উপপুরাণ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডারে যেসব প্রাচীন গ্রন্থ আছে পুরাণ গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সেগুলোর মধ্যে অমূল্য রত্ন বিশেষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নেই, যা পুরাণ গ্রন্থে নেই। মহাভারত সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে—"যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে", পুরাণ গ্রন্থ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য—"যা নেই পুরাণে, তা নেই মননে।" পৃথিবীতে এখনও এমন কিছু কেউ সৃষ্টি বা আবিষ্কার করতে পারেনি যা পুরাণে নেই।

আমাদের জ্ঞানের বিকাশ এবং প্রসারের প্রয়োজনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন শ্রুতি-স্মৃতি সংহিতার তত্ত্বগুলোকে সাবলীল করার জন্য কাহিনীকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। মানুষ মাত্রেই গল্পপ্রিয়। জনশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে পুরাণকার তাই পুরাণ গ্রন্থকে কাহিনী প্রধান করেছেন। এ সব কাহিনীর মধ্যে পুরাণকার কখনো ঐতিহাসিকের ভূমিকায় রাজা-রাজড়ার জীবন দিয়ে, কখনো গল্পকারের ভূমিকায় চণ্ডাল ব্যাধ প্রভৃতি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির জীবন নিয়ে, কখনো বা মুনি-ঋষিদের মতো জ্ঞানী গুণীদের জীবন এবং সাধনা নিয়ে এমন সব কাহিনী রচনা করেছেন যেগুলো নিছক কাহিনী বা গল্প হয়ে থাকেনি। সাহিত্যের কষ্টি পাথরে খাঁটি সোনা হয়ে গিয়েছে। প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর এবং মধুময় করে তোলার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ সূত্রাকারে যা রেখে গিয়েছিলেন পুরাণকার সেগুলোকে কাহিনীর আঙ্গিকে পরিবেশন করে গণচেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন।

পুরাণকে অবলম্বনে পুরাণ সংস্কৃতি শুধু ভারতবর্ষে নয়, চীনে, গ্রীসে, মধ্য আমেরিকায় এবং পরবর্তী সময়ে সেই সব কাহিনীগুলোকে অবলম্বন করে প্রখ্যাত অখ্যাত সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন গল্প, নাটক, কবিতা ইত্যাদি। পুরাণকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শামসুর রাহমান প্রমুখ কবিরা চমকপ্রদ কবিতা রচনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতানুসারে যে কটি মহাপুরাণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে সেগুলো থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে যথাসম্ভব সহজভাবে গল্পাকারে শিব পুরাণের গল্প, বিষ্ণু পুরাণের গল্প, ভাগবত পুরাণের গল্প–নামে পৃথক পৃথক গ্রন্থাকারে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সবশেষে পরিবেশিত কল্কি ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প যদি পাঠকমনকে সামন্যতম তৃপ্তি দেয় তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

প্রকাশক

সূচীপত্র

কল্কি পুরাণের গল্প

কল্কির আবির্ভাব	৭
কল্কি-পদ্মাবতী সংবাদ	১২
অনন্ত মুনির কথা	১৭
কল্কিদেবের কীকট জয়	২৩
রাক্ষসী কুথোদরী ও কল্কিদেব	২৭
কোক-বিকোক সংবাদ	৩১
কল্কিদেবের কলি অভিযান	৩৪
রাজা শশীধ্বজের কাহিনী	৩৯

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প

নারদের ইতিকথা	৫২
বেদবতীর কাহিনী	৬৬
তুলসী ও শঙ্খচূড়ের ইতিকথা	৭০
সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী	৮৩
সুযজ্ঞের গোলোক প্রাপ্তি	৯১
গণেশের ইতিকথা	৯৬
গজানন হলেন একদন্ত	১০৭
কার্তিকের জন্মরহস্য	১১৪
দুর্বাসার দুর্বিপাক	১১৯
ব্রহ্মার দর্পনাশ	১২৪
অষ্টাবক্র কাহিনী	১৩০
অষ্টাবক্রের আর এক কাহিনী	১৩৪
ইন্দ্রের বোধোদয়	১৪১
শ্রীকৃষ্ণ ও শৃগাল সংবাদ	১৪৮
দর্পহারী	১৫০
ধন্বন্তরি-মনসা সংবাদ	১৫৫

কল্কি পুরাণের গল্প

উপ-পুরাণগুলোর মধ্যে কল্কি পুরাণ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রোমহর্ষণ সূতের পুত্র উগ্রশ্রবা এই পুরাণের বক্তা এবং শৌনকাদি ঋষিরা এর শ্রোতা। কল্কি পুরাণ কে প্রথম সঙ্কলন করেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কিন্তু অনেকের মতে, বৎসমুনির পুত্র কাত্যায়ন-শিষ্য মহামুনি বাৎস্যায়ন।

এই পুরাণে কলিযুগের শেষ কল্কিদেবের আবির্ভাব, অলৌকিক শক্তি বলে দিগ্বিজয় এবং ম্লেচ্ছ নিধনের পর কিভাবে আবার সত্যযুগের প্রতিষ্ঠা হল, তারই বিবরণ আছে।

দশাবতারের মধ্যে সর্বশেষ এই কল্কি অবতারকে অনেকেই প্রশস্তি জানিয়েছেন। তার মধ্যে ভক্তকবি জয়দেবের প্রশস্তিটি হল—

"ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশবধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।।'

কল্কি পুরাণকে ভাগবতের মর্যাদা দেয়া হয়। এটিকে বলা হয়েছে 'অনু ভাগবত'।

কল্কির আবির্ভাব

কলির কি অপ্রতিহত প্রভাব!

স্রষ্টার এই সৃষ্টি সুন্দর একটা নিয়মে বাঁধা ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র —যার জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট ছিল, কলির প্রভাবে তা সব গেল। বেদশাস্ত্রকে মেনে যে আর্যধর্ম গোটা পৃথিবীকে একটা সুতোয় বেঁধে রেখেছিল, কলি এসে সেই সুতো ছিঁড়ে দিল। ম্লেচ্ছ ধর্ম, ম্লেচ্ছ ভাষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নিজ নিজ আচার, বিচার, ধর্ম নিয়ে এক একটা গোষ্ঠী স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠল। কেউ আর কাউকে মানতে চায় না, সহ্য করতে পারে না। মন থেকে উদারতা উধাও হয়ে গেল। কপটতায় সবার মন ভরে গেল। হিংসা, রাগ, কুটিলতা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগল। মানুষ এত বেশি স্বার্থপর হয়ে গেল,- যে অন্যের দিকে তাকাবার আর তাদের সময় নেই। নিজে কিভাবে সুখে, ভোগে থাকবে, সব সময় সেই চেষ্টাতেই তারা তৎপর হয়ে উঠল। প্রকৃত ধর্মকর্ম লোপ পেতে লাগল। ফলে আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় এমনভাবে পেয়ে বসতে শুরু করল যে, জীবনের পরমায়ুও কমে যেতে লাগল।

কলির প্রভাবে ব্রাহ্মণ শুধু পৈতেধারী নামে ব্রাহ্মণ হয়ে রইল। তার চরিত্র বদলে গেল। ঠিক তেমনি ভাবেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্ররাও বদলে গেল। ধনীরা হতে থাকল সাধু। আর সাধুরা চোর। মদ, মাংস, সুদের কারবার ঘরে ঘরে যেন মা-বাবার চেয়েও শ্রদ্ধার পাত্র হতে থাকল। মুখে

ধর্মের বুলি, ভেতরে শয়তানি। যেমন পুরুষের ক্ষেত্রে, তেমন মেয়েদের ক্ষেত্রেও। স্রষ্টার নিয়মে পুরুষের ধর্মকাজে স্ত্রী হয়ে তারা সাহায্য করত, তাই তাদের বলা হত সহধর্মিণী। তারাও কলির প্রভাবে পড়ে এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, স্বামীকেই অবহেলা করতে শুরু করে দিল। বলতে গেলে এমন স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে উঠতে লাগল যে, রীতিমত বিস্ময়ের। কুমারী-সধবা-বিধবা—এ যেন আর চিনবার উপায় থাকল না।

স্বভাব যখন মানুষের মধ্যে বদলায় তখন প্রকৃতির মধ্যেও তার রূপ ফোটে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কখনো খরা,কখনো বন্যা। যে পরিমাণ শস্য আগে ফলত, এর ফলে তাও কমতে শুরু করল। বিদেশ হল তীর্থ। প্রজারা করভারে প্রায় মারা যাবার অবস্থায়। হতভাগ্য প্রজার দল যে কোথায় যাবে, তার কোন কূল-কিনারা নেই।

কলি দেখে আর হাসে। যুগের ধর্ম কি সুন্দরভাবেই না সে পালন করে চলেছে।

বসুমতীর চোখে জল। এত অত্যাচার তাঁর সইবে কেন? স্বর্গবাসী দেবতারাও দেখে হতচকিত। প্রজারা বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত ভুলে গেল। কৃষ্ণের নিন্দা শুরু করল।

তাঁরা তখন নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁকে পৃথিবীর কথা জানালে তিনি বললেন—চল, বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনিই এর একমাত্র বিহিত করতে পারবেন।

বিষ্ণু তখন গোলোকে। দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা এসে বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি করে তাঁকে সব কথা বললেন। বিষ্ণু শুনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললেন—ব্রহ্মা, তুমি যখন বলছ, তখন দেখছি পৃথিবীতে আমাকে আবার একবার যেতেই হয়। ঠিক আছে, যাব। শম্ভল গ্রামে (মোরাদাবাদ জেলায়) সুমতি নামে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের বাড়িতে কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করব। ব্রহ্মা, দেবগণ,তোমাদেরও কিন্তু পৃথিবীতে গিয়ে আমার কাজে আমায় সাহায্য করতে হবে। অধর্ম যখন মাথা চাড়া দিয়ে

সৃষ্টিকে বিপর্যস্ত করবে, তখন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা আর ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য আমাকে পৃথিবীতে যে যেতেই হবে। এ যে আমার প্রতিশ্রুতি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। কলির বিনাশ আমি অবশ্যই করব।

নিশ্চিন্ত মনে সবাই চলে গেলেন।

শম্ভল নগরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিষ্ণুযশা আর সুমতি। তাঁদের নিষ্ঠা আর ধর্মপরায়ণতার জন্য সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধেয়। ইতিমধ্যে তাঁদের ঘরে এসেছে তিনটি সন্তান। তাদের নাম—কবি, প্রাজ্ঞ আর সুমন্তক। রাজা বিশাখযূপ এঁদের খুবই অনুরাগী। এরপর শুভদিনে, শুভক্ষণে ভগবান বিষ্ণু কথামত বিষ্ণুযশার ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন।

চতুর্থ এই পুত্রটি জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভল নগরের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক। কি অপরূপ মুখকান্তি, দেহের গড়ন! কি অপরূপ চোখের চাউনি!

পুত্রকে দেখে যখন মা-বাবা বিহ্বল, দেখলেন পরশুরাম, কৃপ, ব্যাস, অশ্বত্থামা (এঁরা অমর) অল্পবয়সী সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির। ব্রাহ্মণ তাঁদের যথোচিত সৎকার করলেন। নবজাতক পুত্রকে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হলেন। ব্রাহ্মণকে বললেন—বিষ্ণুযশ, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কলিকে প্রতিহত করার জন্য তোমার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। এঁর নাম কল্কি। তুমি এঁকে যত্ন কোরো।

যত্নের কথা এরপর কি আর বলার দরকার করে? স্বয়ং বিষ্ণু এসেছেন তাঁদের ছেলে হয়ে, বার্তা চারদিকে রটে গেল। শম্ভল নগর উত্তাল হয়ে উঠল। এমনকি রাজা বিশাখাযূপ পর্যন্ত স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এসে নবজাতককে প্রণাম জানিয়ে গেলেন। এই বিশাখযূপ ছিলেন মাহিষ্মতী নগরীর (বর্তমান নর্মদা তীরে চুলীমহেশ্বর) রাজা। খুবই ধর্মপরায়ণ।

ঠিক বয়সেই বিষ্ণুযশা তাঁর উপনয়ন দিলেন। গুরুকুলে পাঠালেন বেদ অধ্যায়ন করার জন্য।

কল্কি চলেছেন গুরুর সন্ধানে। পথে মহেন্দ্র পর্বত (ওড়িশার গঞ্জাম জেলা থেকে গোন্দবন পর্যন্ত প্রসারিত)। অমর পরশুরাম এখানেই থাকতেন। তিনিই কল্কিকে ডেকে বেদ থেকে শুরু করে সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করালেন। শুধু তাই নয়, অস্ত্রবিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী করে তুললেন। তারপর বললেন—কল্কি, তুমি বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করেছ কলিকে দমন করার জন্য। যাও, পৃথিবীকে ভারমুক্ত কর। সেটাই হবে তোমার গুরু দক্ষিণা।

এরপর কল্কি শিবের আরাধনায় বসলেন। একমনে শিবের স্তব-স্তুতি করতেন, একদিন পার্বতীর সঙ্গে তিনি ষাঁড়ের পিঠে চেপে কল্কিকে দেখা দিলেন। বললেন—কল্কি, তোমার স্তবে আমি তুষ্ট। আমি তোমাকে এই ঘোড়া দিচ্ছি। দ্রুতগামী তো বটেই, এমনকি মুখে কিছু না বললেও, তোমার মনের অভিপ্রায় বুঝে এই ঘোড়া তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। এই শুক পাখিকে তোমায় দিচ্ছি। জানবে, মহাপণ্ডিত এই শুক পাখি তোমাকে সব কাজে সাহায্য করবে। অরা এই রত্নতসরু (হাতল রত্নখচিত) তলোয়ার তোমায় দিচ্ছি। অতি বড় শত্রুও তোমার এই তলোয়ারের আঘাত সহ্য করতে পারবে না।

মহেশ্বরের দেয়া উপহারগুলো নিয়ে কল্কি বহুদিন পর আবার রাজার মত ফিরে এলেন শম্ভল গ্রামে। মা-বাবাকে প্রণাম করে সব কথা খুলে বললেন। বিষ্ণুযশা-সুমতির বুক আনন্দে, ভক্তিতে, গর্বে ফুলে উঠল। কল্কির যে সব বন্ধুবান্ধব ছিল সেই গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি যে-যেখানে ছিল, বন্ধুকে দেখার জন্য ছুটে এল। এমনকি রাজা বিশাখাযূপও এসে প্রণাম করে তাঁর অনুগামী হলেন।

রাজার সঙ্গে কিছুকাল থাকার পর কল্কি বললেন—রাজা, তুমি অশ্বমেধ আর রাজসূয় যজ্ঞ কর। আমি তোমাকে সাহায্য করব। সুপ্রাচীন চন্দ্র আর সূর্য রাজবংশের দুই ধার্মিক রাজপুরুষ দেবাপি আর মরু এখনো হিমালয়ে

রয়েছেন। কলিকে দূর করে তাঁদের সিংহাসনে বসিয়ে, চল আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব।

রাজা বিশাখযূপও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। কারণ, কল্কি তাঁর কাছে আর কোন সাধারণ বীরপুরুষ নন, স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণুর আদেশ অমান্য করার সাধ্য কি? তাছাড়া বিষ্ণু নিজে যখন সহায়, তখন অশ্বমেধ আর রাজসূয় যজ্ঞ কি আর এমন ব্যাপার?

কল্কি-পদ্মাবতী সংবাদ

সিংহলের রাজা বৃহদ্রথ আর রানী কৌমুদী।

একদিন সারা সিংহল আলো করে রাজপ্রাসাদে একটি ফুটফুটে মেয়ের জন্ম হল। ঠিক যেন একটা গোটা পদ্মফুল। মেয়ের মুখ দেখে রাজা-রানীর মন আনন্দে ভরে গেল। মেয়েটির নাম রাখলেন পদ্মাবতী।

মেয়েটি যত বড় হয়ে উঠতে লাগল, সকলেই অবাক হয়ে দেখতেন, আর পাঁচটা মেয়ের মত সাধারণ কোন খেলনা নিয়ে সে খেলত না। মাটি দিয়ে নিজের মনে শিবলিঙ্গ তৈরি করত, বাগান থেকে ফুল তুলে এনে তাঁর পুজো করত। আর তা নিয়ে এমনি মেতে থাকত, সে স্নান-খাওয়াও ভুলে যেত। রানী কিন্তু সবই দেখতেন আর ভাবতেন, এইটুকু বয়সেই কে ওকে অমন করে শিবের পুজো শেখাল?

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। পদ্মাবতী যত বড় হয়ে ওঠে। তত বেশি তার সময় কাটতে থাকে। আর রূপ-লাবণ্যও তত বেশি ঝলমলে করে উঠতে থাকে।

একদিন এভাবে শিবের পুজো করছে পদ্মাবতী, হঠাৎ শিব আবির্ভূত হলেন। বললেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক পদ্মাবতী। স্বয়ং বিষ্ণুই তোমার স্বামী হবেন। তিনি ছাড়া আর কেউ নন। তোমাকে দেখে যে পুরুষের মন চঞ্চল হয়ে উঠবে, সে কিন্তু তক্ষুণি নারী হয়ে যাবে।

শিব তো বর দিয়ে চলে গেলেন। পদ্মাবতীর মাথায় তো যেন আকাশ

ভেঙে পড়ল। সামান্য একজন রাজকন্যা সে। আর কোথায় ভগবান বিষ্ণু। মায়ের কাছে কিন্তু শিবের বরদানের কথা গোপন করল না।

এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। পদ্মাবতীর বিয়ে দেবার বয়স হয়েছে। রাজা বৃহদ্রথ বেশ চিন্তায় পড়লেন। রাজপুত্রের অভাব নেই। কিন্তু এমন মেয়েকে প্রাণ ভরে কার হাতে দেয়া যায়? রানীকে একদিন মনের কথা বললেন। রানী এবার রাজাকে শোনালেন, শিবের কাছ থেকে তাঁদের মেয়ে কি বর পেয়েছে, তার কথা। শুনে রাজা যতটা বিস্মিত, ততখানি অবাক। বিষ্ণু, মানে স্বয়ং ভগবান, হবেন তাঁদের জামাই! এ কি ভাবা যায়? কিন্তু শিবের কথা তো মিথ্যে হবার নয়। তাহলে, নিশ্চয়ই তিনি কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন। কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে রাজার মনে আর একটা প্রশ্ন খেলে গেল। পদ্মাবতী নামে যে মেয়েটি তাদের ঘরে জন্মেছে তাহলে সে কে? স্বয়ং লক্ষ্মী! ভাবতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে যায় রাজার।

অনেক ভেবে চিন্তে রাজা বৃহদ্রথ মেয়ের বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করবেন বলে ঠিক করলেন। শিবের বরে ভগবান বিষ্ণুই যদি এর স্বামী হন, তাহলে এই সভায় নিশ্চয় তিনি আসবেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, রাজা বৃহদ্রথের মেয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভা। কুলে-শীলে-মর্যাদায় রাজার যথেষ্ট সুনাম। পদ্মাবতীর নামও প্রায় অজানা নেই কারো কাছে। অমন মেয়েকে বিয়ে করা, অমন রাজার সঙ্গে আত্মীয় করা, কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

সারা সিংহল যেন উৎসবে মেতে উঠল। পথে পথে অপূর্ব সব তোরণ। ফুলে আর আলোয় সিংহল যে স্বর্গপুরী হয়ে উঠল। আর স্বয়ম্বর সভা? তার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা চলে না। ইন্দ্রপুরীও হার মেনে যায়।

নির্দিষ্ট দিনে একের পর এক রাজপুত্ররা আসতে শুরু করলেন। সকলেই সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত রাজপুত্র। কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ার পিঠে। প্রত্যেকের পরনে ঝলমলে পোশাক। নানা অলঙ্কার। দেখতে দেখতে স্বয়ম্বরসভা রাজপুত্রে ভরে গেল। প্রত্যেককেই রাজা-রাজপুরুষরা মর্যাদা

দেখিয়ে এক একটা আসনে বসালেন।

এরপর রাজা বৃহদ্রথ অন্দরমহলে খবর পাঠালেন পদ্মাবতীকে আনতে।

অল্পক্ষণের মধ্যে পদ্মাবতী এল সভায়—যেন কোন অপ্সরা। সঙ্গে সখীর দল। হাতে ফুলের মালা। একটা করে পা ফেলে সভার মাঝখানে এল পদ্মাবতী। তাকে দেখামাত্রই রাজপুত্ররা দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল বিপর্যয়। রাজা বৃহদ্রথ মেয়েকে নিয়ে পতি-নির্বাচনের জন্য একের পর এক রাজপুত্রের পরিচয় দিতে যাবেন কি, অবাক হয়ে দেখলেন, আসনে যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একজনও আর পুরুষ নেই। সকলেই মেয়ে হয়ে গেছে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মেয়ের সখীদের দলে ভিড়ে গেছে।

হতাশ হলেন রাজা বৃহদ্রথ। হতাশ হল পদ্মাবতীও। তার হাতের মালা হাতেই থেকে গেল। সারা সিংহল মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

পদ্মাবতী নিজের মনেই কেঁদে উঠল—হা শিব, এ কি বর তুমি আমায় দিলে? এতগুলো রাজপুত্র নারী হয়ে গেল? কোথায় নারায়ণ?

কল্কি তখন শম্ভল নগরে রাজা বিশাখযূপ আর নগরবাসীর সঙ্গে সবেমাত্র ধর্মালোচনা শেষ করেছেন। বিদায় নিয়েছেন সবাই। এমন সময় শুকপাখি কল্কির কাছে এসে হাজির হল।

কল্কি বললেন—শুক, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বহুক্ষণ তোমায় দেখিনি। মনটা বড় ছটফট করছিল।

শুক বলল—প্রভু, সিংহলে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে শুনলাম, রাজা বৃহদ্রথের মেয়ে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভা। আড়াল থেকে সেই সভা দেখছিলাম।

এরপর সেখানে যা যা ঘটেছিল আদ্যোপান্ত সব বলে বলল—প্রভু, আমি জেনে এসেছি, আপনিই তাঁর স্বামী। কেন অযথা আমার মাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

শুনে কল্কিদেব মুচকি একটু হেসে বললেন—তাই নাকি শুক? তুমি ঠিক জেনে এসেছ তো?

—না জেনে কি আর এতদূর দৌড়ে এলাম। আহা, পদ্মাবতী বড় বিলাপ করছেন।

কল্কিদেব বললেন—শোন শুক, তোমাকে আর একবার সিংহল যেতে হবে।

শুক বলল—আদেশ করুন।

—পদ্মাবতীকে গিয়ে শুধু বলে আসবে, আমি খুব শিগ্‌গির আসছি।

শুক সঙ্গে সঙ্গে সিংহলে এসে হাজির হল। কিন্তু কিভাবে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করা যায়? দেখল, যে ঘরে পদ্মাবতী আছে, তারই জানলার পাশে একটা নাগকেশরের গাছ। শুক জানলার কাছাকাছি তারই ডালে বসে বলে উঠল—রাজকুমারী, রাজকুমারী তোমার স্বামী বিষ্ণু শীগ্‌গির আসছেন।

কথা শুনে পদ্মাবতী চমকে উঠে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল, নাগকেশরের ডালে এক শুক পাখি। শুক ঐ একই কথা আবার বলে উড়ে শম্ভল নগরে চলে এল।

এর কিছুদিন পর কল্কিদেব শিবের দেয়া সেই দিব্য ঘোড়ায় চেপে সঙ্গে শুককে নিয়ে মুহূর্তে সিংহলে পৌঁছে গেলেন। তারপর সেখানে একটা সরোবর দেখে তারই সোপানে বসলেন।

শুক পাখি আবার উড়ে গেল সেই নাগকেশরের ডালে। জানলা দিয়ে দেখল, খাটে শুয়ে পদ্মাবতী, চারপাশে সখীরা।

ডাকল—রাজকুমারী ও রাজকুমারী, বিষ্ণু যে তোমার জন্য শম্ভল নগর থেকে এসে সরোবরের সোপানে বসে আছেন।

শোনামাত্রই বিছানা থেকে পদ্মাবতী ধড়মড় করে উঠে বসল। ততক্ষণে শুক নাগকেশরের ডাল ছেড়ে চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সখীদের ডেকে বলল—চল, সরোবরে স্নান করে আসি।

রাজকন্যা যাবে সরোবরে রাজপথ দিয়ে। পাল্কি এসে হাজির হল। পদ্মাবতী পাল্কিতে উঠে বসল। সঙ্গে সখীর দল। রাজপথ দিয়ে রাজকন্যাকে আসতে দেখে শহরের মেয়েরা ঘর সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুরুষরা যে যার ঘরে ঢুকে পড়ল, পাছে দেখামাত্রই নারী হয়ে যায়!

সরোবরে এসে রাজকন্যার দেখল, সত্যিই অপরূপ এক যুবাপুরুষ চোখ বুজে শুয়ে আছেন সোপানে। একটু তফাতেই সেই শুক।

শুক বলল—তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাজকন্যা, ডেকে তোলো।

পদ্মাবতীর বুক কেঁপে ওঠে। শুককে বলল—শুক, আমার বড় ভয়। চোখ চেয়ে আমাকে দেখামাত্রই যদি উনি নারী হয়ে যান?

সবেমাত্র পদ্মাবতীর কথা শেষ হয়েছে। কল্কিদেব চোখ মেলে তাকালেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—না পদ্মাবতী, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। বৈকুণ্ঠে তুমিই ছিলে আমার পাশে। এখানেও তুমি আমার পাশেই থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল রাজপ্রাসাদে। রাজা-রানী-রাজপুরুষ যিনি যেখানে ছিলেন সকলেই সেখানে ছুটে এলেন। কল্কিদেবকে সমাদরের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাজা মহাসমারোহে তাঁর সঙ্গে পদ্মাবতীর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

রাজা আর রানীর মনে কোন সংশয় নেই। শিবের বর অব্যর্থ। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুই এই কল্কিদেব। আর তাঁদের মেয়ে—লক্ষ্মীই বটে। তা নইলে এমনটি হবে কেন?

বিয়ে সেরে শম্ভল নগরে কল্কিদেব ফিরে এলেন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে। আর সকলের অনুরোধে যে রাজপুত্ররা নারী হয়ে ছিলেন, তাঁদের আবার পুরুষ করে দিয়ে এলেন।

সকলেই সেই অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা নিচু করল।

অনন্ত মুনির কথা

পদ্মাবতীর সঙ্গে কল্কিদেবের মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেছে। যে রাজা আর রাজপুত্ররা সিংহলে পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর সভায় এসে নারী হয়ে গিয়েছিলেন, কল্কিদেবের অনুগ্রহে আবার তাঁরা পুরুষ হয়ে যেমনটি ছিলেন, তেমনটি হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অনুগামী হলেন। শুধু তাই নয়, অবতারজ্ঞানে তাঁর কাছে থেকে অনেক উপদেশও নিলেন।

কল্কিদেব এবার ফিরে আসবেন নিজের নগরে। আয়োজন চলছে। বৃহদ্রথের রাজপ্রাসাদে সবাই ব্যস্ত। হঠাৎ অনন্ত মুনি এসে হাজির হলেন রাজসভায় কল্কিদেবের কাছে। অনন্ত মুনিকে সিংহলের অনেকেই চেনেন। বয়স যে তাঁর কত হয়েছে, কেউ জানে না। সুদীর্ঘকাল এখানে নির্জনে একটা আশ্রমে থাকেন, সাধনা করেন।

অনন্ত মুনি এসেই কল্কিদেবকে প্রণাম জানালেন। বললেন—আপনি আমায় স্মরণ করেছেন?

কল্কিদেব তাঁকে সমাদর করে বললেন—হ্যাঁ, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেল।

তারপর মৃদু হেসে বললেন—সব জানা, বোঝা হয়ে গেছে তো?

অনন্ত মুনি বললেন—হ্যাঁ, দেব।

কল্কিদেব বললেন—যাও।

এই বলে কল্কিদেব সভা ছেড়ে চলে গেলেন। অনন্ত মুনিও বেরিয়ে এলেন।

রাজা আর রাজপুত্রদের বিস্ময়ের সীমা নেই। কি ব্যাপার? অনন্ত মুনি এলেন। কল্কির সঙ্গে ঠারে-ঠারে কি কথা হল? রহস্য জানার জন্য তাঁদের মনে খুব কৌতূহল জাগল।

বাইরে বেরিয়ে এসে সবাই ঘিরে ধরল মুনিবরকে।

মুনি বললেন—সে এক কাহিনী। আপনাদের যখন এই শোনার ইচ্ছে হয়েছে, তাহলে শুনুন ঃ

আজ আমি অনন্ত মুনি বটে, কিন্তু এক সময় আমি অতি সাধারণ ব্রাহ্মণ ঘরে এক ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলাম। বাড়ি ছিল পুরিকায় (ওড়িশার এক নগর)। আমার বাবা বিদ্রুস খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন। মা সোমাও ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবতী। আমি তাঁদের ঘরে জন্মেছিলাম। আমাকে দেখে মা-বাবার মনে খুব দুঃখ হয়েছিল। কারণ আমি হিজ্ড়ে হয়ে জন্মেছিলাম—না পুরুষ, না নারী।

মনের দুঃখে আমার মা-বাবা শিববনে (হরিদ্বারে) গিয়ে একমনে শিবের তপস্যা করেছিলেন। তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিবের অনুগ্রহে শেষে আমি পুরুষ হয়ে যাই।

যখন আমার বারো বছর বয়স হল, মা-বাবা তখন বেশ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। যজ্ঞরাত নাম এক ব্রাহ্মণের মেয়ে মানিনীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেল। মানিনীকে নিয়ে আমার সংসারও সুখের হয়ে উঠল। কিন্তু এরই মধ্যে একদিন মা-বাবা মারা গেলেন।

স্ত্রী মানিনীকে খুবই ভালবাসতাম ঠিকই, কিন্তু মা-বাবাকে দারুণ শ্রদ্ধা করতাম। তাই তাঁরা যখন মারা গেলেন, মনে খুব দুঃখ পেলাম। যথাসময়ে

শ্রাদ্ধাদি কাজ করলাম। আর সেই থেকেই আমার মন বিষ্ণুপরায়ণ হয়ে উঠল। বিষ্ণুর ধ্যান, বিষ্ণুর নামজপ নিয়েই বেশির ভাগ সময় থাকতাম।

একদিন পুজো, নামজপ সেরে ঘুমোচ্ছি, স্বপ্ন দেখলাম।

দেখলাম, স্বয়ং বিষ্ণু আমার সামনে এসে বলছেন—মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, এদের জন্য মন এত চঞ্চল কর কেন? শোন, এ সবই আমার মায়ার খেলা।

আমি কিন্তু বিষ্ণুর এ কথা মানতে রাজি হলাম না। আমি দেখছি আমার মা-বাবা, আমার স্ত্রী। আর বিষ্ণু বললেন সবই মায়া? আবার বললেন, এ মায়াতে যে জড়াবে, তাকেই কষ্টভোগ করতে হবে। প্রতিবাদ জানাতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে তিনি আর নেই।

মনে আমার দারুণ সংশয়। তা কি করে হয়?

জগন্নাথদেবের মন্দিরের আরাধনা করতাম বটে, কিন্তু মন থেকে কিছুতেই ঐ সংশয় আর যেত না।

নাম-গান আর জপ নিয়ে এভাবে বারো বছর কেটে গেল।

এরপর একদিন সমুদ্রে স্নান করতে গেছি।

বিষ্ণু মন্দিরে থাকি, নাম-গান করি, রোজই সমুদ্রে স্নান করে আসি। অনেকের কাছেই আমি পরিচিত।

স্নানে নেমেছি। মনের আনন্দে ঢেউ-এর দোলায় স্নান করছি। করতে করতে কি যে হল, আমি আর কোনমতেই উঠে আসতে পারলাম না। ঢেউ যেন আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল। যতই ওঠার চেষ্টা করি, নোনা জলে হাবুডুবু খাই। শেষে দেখি, হাঙর, বড় বড় মাছ আমাকে খাবলাতে শুরু করল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি বালির ওপর পড়ে আছি। তখন প্রায় আধমরা অবস্থায়। মাথার কাছে বসে আমার মাথায় হাত বুলোচ্ছেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তখন সন্ধ্যা।

বৃদ্ধের নাম বৃদ্ধশর্মা। সমুদ্রের কাছেই তাঁর বাড়ি। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন। তিনি আমাকে সেখান থেকে নিজের বাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। খুব সেবা-যত্ন করে আমায় সুস্থ করে তুললেন। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী দুজনেই আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতে লাগলেন। পুরী থেকে যে কত দূরে আমি এসে এভাবে উঠেছি, জানি না। কিভাবে ফিরব তাও জানি না। অনেকদিন হয়ে গেল, মানিনীই বা এখন কোথায়, তাও জানি না। বাধ্য হয়ে সেখানেই থেকে গেলাম।

তখনও আমি যুবক। বৃদ্ধশর্মা আমাকে ব্রাহ্মণ আর আমার সব কিছু জানা আছে দেখে আরও খুশি হয়ে আমাকে তাঁর আর এক ছেলে করে নিলেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল,নাম চারুমতী। তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতেই রেখে দিলেন। মানিনীকে ভুলে আমিও সেখানে থেকে গেলাম।

ঘর-সংসার করি। জ্ঞানগম্যিও আছে। ব্রাহ্মণ অভাবী ছিলেন না। ফলে খাওয়া-পরার চিন্তাও ছিল না। বন্ধু-বান্ধব অনেক জুটে গেল। আমার নিজেরও জয়, বিজয়, কমল, বিমল, আর বুধ নামে পাঁচটা ছেলে হল। চারুমতীর সেবার ত্রুটি নেই। ইতিমধ্যে আমার পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর-শাশুড়ীও দেহ রেখেছেন। আমারও যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে।

আমার বড় ছেলের নাম ছিল বুধ। তার বিয়ে দেবার বয়স হয়েছিল। চারুমতীর সঙ্গে পরামর্শ করে ধর্মসার নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে চাইলে তিনি তো কৃতার্থ হয়ে উঠলেন।।

বিয়ের দিন সকালে সমুদ্রে এসেছি। শুভকাজ করার আগে পিতৃ-পুরুষকে শাস্ত্রমতে জল দিয়ে তুষ্ট করতে হয়। সেই সঙ্গে আরো কিছু কাজ করতে হয়—যাকে বলে আভ্যুদয়িক নান্দীমুখ। বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে। চারদিকে যেন উৎসব চলছে। মনের আনন্দে সমুদ্রে এসে জলে ডুব দিলাম। বেশ করে ডুবে স্নান করলাম। তারপর জল থেকে উঠতে গিয়ে দেখলাম—এ কি! এ যে সেই পুরীর ঘাট, সেই পরিচিত জন। কেউ স্নান করছে, কেউ সাঁতার দিচ্ছে, কেউ বা তীরে গা মুছছে।

আমি তো রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। হাঁ করে এদিক ওদিক ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলাম। জল থেকে যেন আর উঠে আসতে পারছি না। মনে দারুণ ভয় হয়ে গেল। আমি কি পাগল হয়ে গেলাম!

আমার রকম-সকম দেখে আমার বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত মানুষেরা আমাকে জল থেকে তুলে নিয়ে এল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল-কি হয়েছে? অমন করে কি দেখছ? কোন জবাবই আমি দিতে পারি না। খবর পেয়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মানিনী এসে হাজির হল। মানিনীকেও দেখলাম। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারলাম না।

সকলেই ধরে নিল, নিশ্চয়ই আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি।

ঠিক সেই সময়ই একজন গেরুয়াবসন সন্ন্যাসী ঘাটে এসে হাজির। সকলে মিলে তো আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল—বাবা, বড় ভাল ছেলে। হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। দয়া করে একে ভাল করে দাও।

সেই সন্ন্যাসী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন—তোমার নাম অনন্ত না? আজই তো তোমার বড় ছেলের বিয়ের দিন? বাড়িতে তোমার আত্মীয়-স্বজন-কুটুমে ভর্তি, আর তুমি এখানে? তুমি এখানে কেমন করে এলে? তাছাড়া তোমার বয়সই বা এত কমে গেল কি করে? ওখানে তোমাকে দেখেছিলাম সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আর এখানে তুমি তিরিশ বছরের যুবক হলে কি করে?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে সকলের তো আর বিস্ময়ের শেষ নেই। মানিনী তো কেঁদে আকুল—সন্ন্যাসী এসব কি বলছেন? দেখে তো ওঁকে কোন পাগল বলে মনে হয় না। একজন সিদ্ধপুরুষ।

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললেন—তোমার ছেলের বিয়েতে আমারও নেমন্তন্ন ছিল। তা আমিই বা আজ এই পুরীর ঘাটে কিভাবে এলাম?

তারপর চোখ বুজে স্থির হয়ে একটু বসে বললেন—বুঝেছি, এ সবই সেই বিষ্ণুর মায়া। তাছাড়া আর কিছু নয়।

সন্ন্যাসী এ সব কথা বলার পর আমি বললাম—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিষ্ণুর মায়া। এই মায়ার ওপর আমার একটু সংশয় ছিল। শুনে সন্ন্যাসী বললেন—বিষ্ণু মায়া দিয়েই তো জগতকে বেঁধে রেখেছেন। ঐ খেলনা দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা-শিবেরও এর হাত থেকে নিস্তার নেই, তুমি-আমি তো কোন্ ছার।

অনন্ত মুনির জীবনের এই অদ্ভুত ঘটনা শুনতে শুনতে রাজা-রাজপুত্ররা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুনিবর একটু থামতেই সমস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল—তারপর?

—তারপর সন্ন্যাসীর পরামর্শে এখানে এসে নির্জন স্থান দেখে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যায় বসলাম। অনন্ত মুনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন—সন্ন্যাসী আরও বলেছিলেন, তপস্যার শেষে কল্কিরূপী স্বয়ং বিষ্ণুকে যখন তুমি দেখবে, জানবে, তোমার সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

কত বছর যে আমার তপস্যায় কেটে গেল, জানি না। আজ মুক্ত হলাম।

কল্কিদেবের কীকট জয়

বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদের আধিপত্য চরমে। বৌদ্ধরা সনতান বেদগ্রন্থকে স্বীকার করে না। যাগ-যজ্ঞ-পশুবলি, দেব-দেবীর মূর্তি গড়ে পুজো করায় এরা বিশ্বাসী ছিল না। তারা মায়াবাদী। ম্লেচ্ছরা আবার এদের ওপরে যেত। আচার-বিচার তো ছিলই না, গো-মাংস খেত। আর বেদগ্রন্থকে অপমান করত। এরা বেশির ভাগই হয় অনার্য, নয় অহিন্দু।

শম্ভল নগরে যখন কল্কিদেবের আবির্ভাব ঘটেছে, তার আগে থেকেই কীকট দেশ (প্রাচীন মগধ রাজ্য) বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছদের অধিকারে। তারপর থেকে তাদের প্রতাপ এমন বাড়তে শুরু করল যে, আশেপাশের দেশও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল।

সিংহল থেকে পদ্মাবতীকে বিয়ে করে নিয়ে ফেরার পর কল্কিদেব বেশ কিছুকাল আর মাথা ঘামাননি। ঘর-সংসার আর বন্ধুবান্ধব নিয়েই মেতে ছিলেন। কল্কিদেবের তিন দাদা কবি, প্রাজ্ঞ আর সুমন্তকের প্রত্যেকেরই দুটি করে ছেলে হয়ে গেছে। কল্কিরও জয় আর বিজয় নামে দুটি ছেলে হয়েছে।

কল্কির উৎসাহে অশ্বমেধ যজ্ঞেরও আয়োজন চলছিল।

ইতিমধ্যে খবর এল, বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছতে কীকট দেশ নাকি দুর্ভেদ্য হয়ে গেছে। আর বৌদ্ধসেনারা এমন বিক্রমশালী হয়ে উঠেছে, যে কোন মুহূর্তে তারা মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে।

খবর আসা মাত্রই কল্কিদেবের নির্দেশে শম্ভল নগরে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কল্কিরা চার ভাই দারুণ বড় যোদ্ধা তো বটেই, গর্গ-ভর্গ-বিশাল-এর মত বন্ধু বান্ধবরাও কম যান না। রাজা বিশাখযূপ তো আছেনই। কীকট দেশে কল্কিদেব যুদ্ধে যাবেন শুনে সবাই যে যার সেনাদল নিয়ে হাজির। রথ, হাতি, ঘোড়া, ধ্বজ-পতাকায় মাটি যেন আর দেখা যায় না।

কল্কিদেব নিজে ঘোড়ার পিঠে চেপে, কোমরে শিবের দেয়া তলোয়ার নিয়ে সেনানায়ক হলেন। দুই অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কীকটদেশে এসে এমনভাবে বৌদ্ধসেনাদের আক্রমণ করলেন যে তারা যেন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

তাই দেখে কল্কিদেব বিদ্রুপ করে বললেন—ভয়ে সব পালাচ্ছে? এর নাম তোমরা বীর পুরুষ ! যদি পুরুষ হও তো যুদ্ধ কর।

কল্কির এই বিদ্রুপ শুনে জিন রেগে আগুন হয়ে উঠল। মস্ত বড় যোদ্ধা তো বটেই জিন, তার ওপর যত রকমের অস্ত্রশস্ত্র আছে সবেতেই পারদর্শী। সঙ্গে সঙ্গে গায়ে বর্ম এঁটে ঘোড়া, শূল নিয়ে ষাঁড়ের মুখ ঘুরিয়ে সরোষে এসে কল্কিদেবকে আক্রমণ করল।

জিনের সেই আক্রমণ এমনি ভীষণ ছিল যে কল্কিদেব সামলাতে পারলেন না। একটা শূল এসে তাঁকে এমন আঘাত হানল যে, ঘোড়ার পিঠে থেকে ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় জ্ঞান হারালেন। জিনের ক্রুদ্ধ মূর্তির সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে কল্কিদেব একা। তীরবেগে জিন ছুটে এসে চেষ্টা করল কল্কিকে তুলে চুরি করে নিয়ে পালাতে, কিন্তু তুলতে পারল না। বিশাখযূপ তাই দেখে পড়ি-কি-মরি করে সেখানে রথ নিয়ে ছুটে এসে কল্কিদেবকে নিজের রথে তুলে নিলেন, আর লাথি মেরে জিনকে অজ্ঞান করে ফেলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দুজনেরই জ্ঞান ফিরে এল। কল্কিদেবের শরীরে তখনো শূলের ব্যথা। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। জিন অজ্ঞান করে সেগুলো সব কেড়ে নিয়েছিল। তাই দেখে শূলের ব্যথা ভুলে কল্কিদেব শুধু হাতেই রথ থেকে

রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিল-ঘুসি-চড়-লাথি মেরে হাজার হাজার বৌদ্ধসেনাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দেন এবং যমদূতের মত বৌদ্ধসেনাদের মধ্যে ঘুরতে লাগলেন। ওদিকে, তাঁর দুই ছেলে জয়-বিজয়, বন্ধু গর্গ, ভর্গ, বিশাল হাজার হাজার বৌদ্ধসেনা বিনাশ করল।

তারপর কল্কিদেব জিনকে বললেন—আমার হাতে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, এটা জেনে রেখো।

জিন বলল—তুমি কি আমাকে ভাগ্য দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? আমরা ভাগ্য মানি না। দেখতে চাই তুমি কত বলবান যে তোমার হাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এই আমি অস্ত্র হানছি, তোমার ক্ষমতা থাকে, নিজেকে সামলাও।

এই বলে জিন একের পর এক মারাত্মক অস্ত্র কল্কিদেবকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। এক সময় জিনের সব অস্ত্র শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দেখল কল্কির গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

কল্কিদেব এবার সরোষে জিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে এক লাফে চুলের মুঠি ধরে ষাঁড়ের পিঠ থেকে টেনে নামাতেই দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শেষে কল্কিদেব গদার এক আঘাতে জিনকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

জিন পড়ে গেল দেখে মহাবলশালী শুদ্ধোধন আর স্থির থাকতে পারল না। গদা হাতে খালি পায়ে বিদ্যুতের মত সে এসে আক্রমণ করল কল্কিদেবকে। কল্কিদেবও সমানে তা প্রতিহত করে চললেন। সেই অবকাশে কল্কির বড় দাদা কবি আচমকা এসে শুদ্ধোধনকে গদা দিয়ে এমন মারলেন যে সে জ্ঞান হারাল। কিন্তু কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর উঠে কবিকে গদা দিয়ে এমন প্রহার করল যে কবি জ্ঞান হারালেন না বটে, তবে কেমন যেন অবশ হয়ে গেলেন।

কবিকে প্রতিহত করে শুদ্ধোদন মুখ ফেরাতেই দেখে, বিরাট কল্কিসেনা তাকে ঘিরে ধরেছে। বাধ্য হয়ে শুদ্ধোধন মায়াদেবীকে স্মরণ করে মায়াযুদ্ধ শুরু করে দিল। সিংহ, বাঘ, সাপ, আগুন, জল, বিদ্যুৎ যেন রণক্ষেত্রে আছড়ে পড়তে লাগল।

কল্কিদেব দেখলেন শুদ্ধোধন তাঁরই মায়ার আশ্রয় নিয়েছে। সুকৌশলে তিনি সেই মায়াকে কাটিয়ে দিতেই বৌদ্ধরা হীনবল হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে ম্লেচ্ছরাও। তাই দেখে কল্কিসেনারা সোল্লাসে বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছা সৈন্যদের যখন প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় দেখল হাজার হাজার বৌদ্ধ আর ম্লেচ্ছ রমণী রথ, ঘোড়া, গাধা, ষাঁড়ের পিঠে চেপে, হাতে নানা হাতিয়ার নিয়ে রণক্ষেত্রে এসে হাজির হল। কল্কিসেনারা দেখে বিস্ময়ে পিছিয়ে এল।

কল্কিদেব বললেন—তোমরা রমণী, আমরা পুরুষ। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ব করা কি আমাদের উচিত? তাছাড়া তোমরাই বা রণক্ষেত্রে এলে কেন?

রমণীরা বলল—তোমরা নির্বিচারে আমাদের স্বামীদের হত্যা করলে। দেখ, আমরা অবলা নেই। তার প্রতিশোধ আমরাও নিতে জানি।

এই বলে রমণীরা বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে ফেলল। কিন্তু একটাও বাণ বা অস্ত্র কল্কিদেবের গায়ে লাগল না।

বিস্ময়ে রমণীরা হতবাক। তাদের মনে হল, অস্ত্রগুলো যেন কথা বলে উঠল। রমণীরা শুনল, অস্ত্রগুলো যেন বলছে—আমরা কাকে গিয়ে আঘাত হানব? যিনি আমাদের মন্ত্রশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে? তাহলে তো নৃসিংহরূপে ভগবান বিষ্ণু যখন হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, তখনো আমরা নৃসিংহকে মারতে পারতাম।

একদিকে অস্ত্র বিফল, আর একদিকে এ সব কথা শুনে রমণীরা এমনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে শেষে কল্কিদেবেরই শরণাপন্ন হল।

কীকট দেশের প্রতাপ নিশ্চিহ্ন করলেন কল্কিদেব।

রাক্ষসী কুথোদরী ও কল্কিদেব

কীকট দেশ জয় করে কল্কিদেব সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে চক্রতীর্থে (বিহারের নিমসার-এ) এসেছেন কিছুটা তীর্থ করার জন্য। হঠাৎ বেশ কিছু মুনি সেখানে কল্কিদেবের কাছে এসে হাজির হলেন।

কল্কিদেব দেখেই বুঝলেন, দারুণ ভয় পেয়ে মুনিরা প্রায় দৌড়েই এসেছেন। তাই আগে তাঁদের আপ্যায়ন করে বসালেন।

তারপর বললেন—দেখে মনে হচ্ছে আপনারা খুবই সন্ত্রস্ত। কি এমন হয়েছে যে আপনারা এত ভীত হয়ে পড়েছেন? কে আপনাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

মুনিরা বললেন—দেব, আমরা অনেকদিন ধরে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি শুধু আপনারই অপেক্ষায়।

কল্কিদেব বললেন—আপনারা নির্ভয়ে বলুন, কে সে আপনাদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। যদি সে দেবরাজ ইন্দ্র হয়, জেনে রাখুন, আমার হাত থেকে সে রেহাই পাবে না।

—না দেব। এ এক বিকটাকার রাক্ষসী। কালঞ্জক রাক্ষসের স্ত্রী কুথোদরী। কুম্ভকর্ণের নাতনি, নিকুম্ভের মেয়ে। এর একটা ছেলে আছে। পাঁচ বছর বয়স হবে—নাম বিকুঞ্জ। এই রাক্ষসী হিমালয়ে মাথা আর নিষধ

পর্বতে পা রেখে ছেলেকে একটা স্তনে দুধ খাওয়ায়। এর নিঃশ্বাসে সব সময় যেন ঝড় বইছে। আমরা কোনমতেই স্থির হয়ে বসতে পারছি না। হিমালয়ে আমাদের তপোবনে হাল যা হয়েছে, তা আর বলার নয়। দেব, আপনি আমাদের ঐ রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচান।

মুনিদের প্রার্থনায় কল্কিদেব সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সেনারাও প্রস্তুত হয়ে কল্কিদেবকে অনুসরণ করল। মুনিরা আগে আগে চললেন।

রাত নেমে এল দেখে কল্কিদেব সেনাবাহিনী নিয়ে হিমালয়ের একটা উপত্যকায় রাতটুকু কাটালেন। পরদিন সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু হল।

কিছুটা যেতেই কল্কিদেবের সঙ্গে সেনারা সবিস্ময়ে দেখল, পাহাড়ের ঢল বেয়ে একটা দুধের নদী নেমে আসছে। এত জোরে নেমে আসছে যে তার থেকে ফেণা ছিটকে পড়ছে চারদিকে।

কল্কিদেব মুনিদের জিজ্ঞেস করলেন—দুধের নদী এখানে কোথা থেকে এল?

মুনিরা বললেন—দেব, এই সেই রাক্ষসী কুথোদরীর একটা স্তনের দুধ। বিকুঞ্জ খায় একটা স্তনের দুধ। আর একটার দুধ এভাবেই নদী হয়ে নেমে যায়। সাত ঘন্টা বাদে আবার এরকম দুধের নদী বইবে।

সেনারা শুনে তো অবাক। সামান্য একটা স্তনের দুধে যার এমন নদী বয়ে যায়, তাহলে তার শরীরটা কত বড়! আর শক্তিই বা কতখানি!

যাই হোক, স্বয়ং কল্কিদেব যখন সঙ্গে আছেন, তখন অত ভাবনার কি?

মুনিরা পথ দেখিয়ে আর কিছুটা আনতেই চোখে পড়ল রাক্ষসীকে। কালো মেঘের মত গায়ের রঙ। পাহাড় জুড়ে যেন বসে আছে। দেখল ছেলে বিকুঞ্জ তার স্তন-দুধ খাচ্ছে।

দেখামাত্রই সেনারা তীর-ধনুক, শূল-ত্রিশূল তুলে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাবে কি, কল্কিদেব বাধা দিলেন। বললেন—না, না। ও কাজ

কোরো না। আমি নিজে যাব। আমার সঙ্গে সামান্য গজারোহী আর অশ্বারোহী যাবে। বাকি তোমরা এই গুহার চারদিকে আগুন জ্বেলে থাক।

সামান্য সৈন্য নিয়ে কল্কিদেব এগোলেন। খানিকটা দূর থেকে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে একটা বাণ ছুঁড়লেন। সজোরে তীরটা গিয়ে রাক্ষসীর বুকে আচমকা বিঁধতেই সে এমন ভীষণ গর্জন করে উঠল যে, গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে উঠল, আর সেনাপতিরা প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তারপর পাহাড়প্রমাণ হাঁ করে এত জোরে নিঃশ্বাস টানতে লাগল যে, হাতি, ঘোড়া থেকে সেনা-সমেত কল্কিদেবও সেই টান সামলাতে না পেরে একেবারে রাক্ষসীর পেটের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

দেখে তো সকলে 'হায়-হায়' করে উঠলেন। শেষে কি হল! মুনিরা তো রাক্ষসীকে শাপ-শাপান্ত করতে শুরু করলেন। ঋষিরা যে যেখানে ছিলেন, সকলে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। সেনারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

গজারোহী অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে কল্কিদেব রাক্ষসীর পেটের ভেতর ঢুকে দেখলেন, কি ঘোর অন্ধকার! তাছাড়া এখানে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তো চলবে না। মুনিদের প্রার্থনা যে তাঁকে পূরণ করতেই হবে।

রাক্ষসীর মুখ তাকানো বন্ধ হয়নি। তখনো সমানে নিঃশ্বাস টেনে চলেছে। কল্কিদেব একটা বাণ দিয়ে আগুণ তৈরি করে, সঙ্গে যা কিছু ছিল তাই দিয়ে আগুনকে জ্বালালেন। তারপর তাঁর সেই মোক্ষম খাঁড়া দিয়ে ভেতর থেকেই সজোরে রাক্ষসীর বিশাল পেট চিরে দু ফালা করে দিলেন। আর একবার বিকট আর্তনাদ করে উঠল কুথোদরী। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগেই সকলকে নিয়ে কল্কিদেব তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কুথোদরীও মারা গেল। সেনারা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

মায়ের এই অবস্থা দেখে পাঁচ বছরের ছেলে বিকুঞ্জ মহাক্রোধে সেনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার হাতের চাপে, মুঠোর ঘায়ে কল্কিদেবের বেশ কিছু সেনা মারা গেল।

কল্কিদেব আর কালবিলম্ব না করে গুরুদেব পরশুরামের দেয়া ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে শেষে তার মাথা কেটে দিতে বাধ্য হলেন।

হিমালয় শান্ত হল। মুনিরাও নিশ্চিন্ত হলেন।

আকাশ থেকে দেব-গন্ধর্ব যাঁরা এই যুদ্ধ দেখছিলেন, তাঁরাও কল্কিদেবকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন।

কোক-বিকোক সংবাদ

কোক আর বিকোক দুই ভাই—কলির দুই বিশ্বস্ত রাক্ষস অনুচর। কলির রাজধানী বিশসন নগরেই তারা থাকত আর যথেচ্ছ অত্যাচার করে বেড়াত।

এরা ছিল শকুনির নাতি, বৃকাসুরের ছেলে। তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে এমন কেউ ছিল না, যে ওদের বধ করতে পারে। অসুর তো নয়, যেন মহাসুর। দুই ভাইয়ের গায়ে যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা, অস্ত্রশাস্ত্রেও তেমনি পারদর্শী।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে এই দুই ভাই এমন দাবিয়ে চলত যে, কার সাধ্য তাদের সামনে দাঁড়ায়? সাধারণ মানুষ, পর্বতগুহাবাসী। মুণি-ঋষিরা তো দূরের কথা, দেব-গন্ধর্বরাও ভয়ে ভয়ে চলতেন। ফলে কলির বিরোধিতা করে, এমন সাহস কারোরই ছিল না। সকলেই তাই দিন গুণত, কবে এই দুই ভাই-এর হাত থেকে তারা মুক্তি পাবে।

কোন কিছুই চিরকাল চলতে পারে না। সব কিছুরই একটা শেষ আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউই অমর নয়। জীবন-ধারণ করলে এক সময় তাকে মরতেই হবে। কোক-বিকোকেরও বোধ হয় সেই সময় ঘনিয়ে এসেছিল।

কল্কিদেবের সঙ্গে যখন কলির বিরোধ শুরু হল, তাঁর অন্যান্য সেনাপতিরা যখন কলির অনুগামীদের সঙ্গে লড়াই করছিল, তখন কল্কিদেব নিজে গদা হাতে রুখে দাঁড়ালেন কোক আর বিকোকের বিরুদ্ধে।

কল্কিদেবকে গদা হাতে তাদের দিকে তেড়ে আসতে দেখে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দু ভাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

একদিকে গদা হাতে একই সঙ্গে দুই মাহসুর, আর একদিকে একা কল্কিদেব। গদার সঙ্গে গদার ঘর্ষণে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। তর্জনে-গর্জনে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠতে লাগল। সে কি দারুণ গদাযুদ্ধ চলল, তা বর্ণনা করা যায় না। হঠাৎ এক সময় কোক-বিকোকের আঘাতে কল্কিদেবের হাত থেকে গদা খসে পড়ে গেল।

সোল্লাসে দুই অসুর মারার জন্য এগিয়ে আসছে দেখে কল্কিদেব চকিতে ধনুক তুলে নিয়ে তাতে ভল্ল (একজাতীয় তীর) লাগালেন। ফলাটা (দেবদারু পাতার মত) তুলে নিয়ে বিকোককে লক্ষ্য করে এত জোরে ছুঁড়লেন যে, তার মাথাটা কেটে পড়ে গেল। কোক সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডটা তুলে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে তাকাতেই বিকোক বেঁচে উঠে আবার তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল। দেখে, কল্কিদেব অবাকই হলেন।

কল্কিদেব এবার কোকের মাথা নামিয়ে দিলেন। দেখলেন, ঠিক একইভাবে বিকোক তাকে বাঁচিয়ে তুলে কল্কিদেবের সঙ্গে মরণ-পণ লড়াই শুরু করে দিল। খাঁড়া এসে বারবার আঘাত হানছে দেখে কল্কিদেব এবার একই বাণে একই সঙ্গে দুই ভায়ের মাথা নামিয়ে দিলেন। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলেন, মাথা যেখানে থাকার সেখানেই আছে। মরেও ওরা মরল না। দেবতারাও যেমন হতাশ হলেন, কল্কিদেবও তেমনি বেশ চিন্তায় পড়লেন। কিভাবে এই দানবদুটোকে মারা যায়?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কল্কিদেব, কোক-বিকোক লাল চোখে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এল। কল্কিবাহন শিবের দেয়া সেই ঘোড়া দুজনকে এত জোরে আঘাত করল যে দুজন দুদিকে ছিটকে পড়ল।

সামান্য একটা ঘোড়ার এত তেজ! রেগে আগুন দুই ভাই। উঠে তাঁর দিকে তীর ছুঁড়তে যাবে কি, ঘোড়াও তেড়ে এসে দুজনের বাহু সজোরো কামড়ে ধরল। প্রচণ্ড সে কামড়ে দুই ভাই-এর বাহুর হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে

গেল, ধনুক-তীর গুঁড়িয়ে গেল। হাতে অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় সে সব ভুলে গিয়ে মহাবলেরা ঠিক করল, লেজ ধরে ঘোড়াকে শূন্যে ছুঁড়ে দেবে। এই ভেবে যেই তারা তার লেজ ধরতে গেল অমনি ঘোড়া জোড় পায়ে দু ভাইয়ের বুকে এত জোরে চাট বসাল যে বেশ কিছু দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে তারা জ্ঞান হারাল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার উঠে দাঁড়াল।

সামনে কল্কিদেবকে দেখে দাঁত কড়মড় করে আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল।

ঠিক সেই ফাঁকে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ব্রহ্মা কল্কিদেবের কাছে এসে কানে কানে বলে গেলেন—ওরা আমার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিল যে, কোন অস্ত্রে ওদের মৃত্যু হবে না, একজন মরলে অপরজন তার দিকে তাকালেই বেঁচে উঠবে। ওদের মৃত্যুর একটাই মাত্র পথ—একই সঙ্গে দুজনের মাথায় আপনাকে ঘুসি মারতে হবে।

কল্কিদেবের চিন্তা দূর হয়ে গেল। তিনি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে খালি হাতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন কোক-বিকোকের দিকে।

দেখে কোক-বিকোক তো হেসেই খুন। তাদের সঙ্গে বাহুযুদ্ধ করবে এমন সামান্য একটা মানুষ! নিজেরাও অস্ত্রশস্ত্র ফেলে আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে এল। শুরু হল সে এক দারুণ মল্লযুদ্ধ। বাহুযুদ্ধের মধ্যে কল্কিদেব সব সময়ই রইলেন সুযোগের অপেক্ষায়, কোন রকমে দু ভাইকে নিজের দু পাশে আনতে পারলে হয়।

বেশ কিছুকাল কসরৎ করার পর হঠাৎ এক সময় যেই সে সুযোগ এল, কল্কিদেব মুহূর্ত অপেক্ষা না করে একই সঙ্গে দুই হাতে দু ভাইয়ের মাথায় এমন জোরে ঘুসি বসিয়ে দিলেন, যেন দুটো পাহাড় একই সঙ্গে তাদের মাথায় পড়ে মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। প্রাণশূন্য হয়ে তাদের বিশাল দেহ লুটিয়ে পড়ল।

কোক-বিকোকের নিধন দেখে দেবসমাজ যেন উৎসবে মেতে উঠল।

কল্কিদেবের কলি অভিযান

দেবত্রাস কুথোদরীকে হত্যা করে সসৈন্যে কল্কিদেব এসেছেন হরিদ্বারে। গঙ্গাতীরে শিবির পড়েছে।

রাত শেষ হয়ে সবে উষার আলো দেখা দিয়েছে। কল্কিদেব স্নানে নেমে গঙ্গার জলে ভালভাবে স্নান সারলেন। তারপর উঠে আসতেই বেশ কিছু মুনি-ঋষি তাঁকে প্রণাম জানালেন। তাঁদের সামনে দুই প্রবীণ অথচ নবীন পুরুষ। মুনিদের মধ্যে ছিলেন বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, ত্রিত, দুর্বাসা, দেবল, কণ্ব—সব প্রাচীন অমর মুনি-ঋষিরা। কল্কিদেব সকলকেই প্রতি-নমস্কার করে বললেন—সামনের এই দুই প্রবীণ অথচ নবীন পুরুষকে তো ঠিক অনুমান করতে পারছি না।

দীর্ঘদেহী দৃপ্তশালী তাঁদের মধ্যে প্রথমজন আত্মবংশের পরিচয় দিয়ে বললেন—আমিই সেই সূর্যবংশের রাজা রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা শীঘ্রগের পুত্র মরু। ব্যাসদেবের মুখেই শুনেছিলাম, কলিকে খর্ব করার জন্য কল্কিদেবরূপে আপনি আসছেন কলাপ গ্রামে (হিমালয়ের দক্ষিণে। যদুকুল ধ্বংস হলে সত্যভামা এখানে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন।) আপনারই অপেক্ষায় এতদিন তপস্যারত ছিলাম।

এবার প্রায় একই রকমের দীর্ঘদেহী দ্বিতীয়জন বললেন—আমি চন্দ্রবংশের রাজা প্রতীপকের পুত্র দেবাপি। ভাই শান্তনুকে সিংহাসনে

বসিয়ে কলাপ গ্রামে আমিও আপনারই অপেক্ষায় এতদিন তপস্যারত ছিলাম। আজ আপনাকে দেখে আমরা কৃতার্থ হলাম।

কল্কিদেব বললেন—যাক, তোমাদের পেয়ে আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। মরু, দেবাপি—আর তপস্যা নয়। বিখ্যাত দুই বংশের মহাবীর তোমরা। এই পৃথিবীর শাসনের ভার আমি তোমাদের হাতেই দিয়ে যাব। তোমরাও আমাদের সঙ্গী হও।

রাজা বিশাখযূপ আর রাজা রুচিরাশ্ব কল্কিদেবের নির্দেশে তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে মরু আর দেবাপির বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এমন সময় আকাশ পথ থেকে দুটি দুরন্ত অপূর্ব গতিশীল রথ নেমে এল। নানারকম রত্ন দিয়ে তৈরি যেন সেই রথ। ঝলমল করছে। রথে ধনুক-তীর থেকে নানা আকারের নানা শক্তিশালী সব হাতিয়ার।

রথদুটোকে হঠাৎ ঐভাবে আসতে দেখে সকলেই চমকে উঠলেন।

কল্কিদেব বললেন—বিশ্বকর্মার তৈরি এই রথ দুটি এতদিন তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। এই রথের কোন সারথি নেই। তোমাদের মনই এর সারথি। মনে মনে যেখানে যাবার ইচ্ছে করবে, এই রথ তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাবে। তোমরা দুজন এই রথ নিয়ে দিগ্বিজয়ে যাবে, তাই ইন্দ্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সবেমাত্র এই সব কথা শেষ হয়েছে, ভিক্ষুকের মত দেখতে এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল। রোগা শরীর। ম্লান হয়ে গেলেও কাঁচা সোনার রঙ গায়ে। হাতে লাঠি। দেখলেই মনে হয়, উঁচুদরের কোন সাধু।

কল্কিদেব তাঁকে দেখহে সসম্ভ্রমে উঠে বসতে আহ্বান জানালেন। অতিথিকে যেভাবে অভ্যর্থনা করে, সেভাবে সমাদর জানালেন। তারপর বললেন—বলুন, কি আপনার পরিচয়? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

সাধু বললেন—আমি কৃতযুগ (সত্যযুগ)। আপনি এসেছেন জানতে পেরে আপনার কাছেই এলাম। আপনার বিধানে সত্যরক্ষাই তো আমার কাজ।

কল্কিদেব এবার শিবিরের সকলকে শুনিয়ে বললেন—আর কি? এই দেখ, স্বয়ং সত্যযুগ এসে গেছে। আর বিলম্ব নয়। সকলে তৈরি হয়ে নাও।

সবাই বুঝি এই আদেশটুকুর অপেক্ষাতেই ছিল।

দিব্য দুই রথে চেপে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন মহাবীর মরু আর দেবাপি। তাদের সঙ্গে মাথায় কালো রঙের শিরস্ত্রাণ পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী রাজা বিশাখযূপ অগণিত গজ, অশ্ব, পদাতিক সেনা নিয়ে—প্রায় ছয় অক্ষৌহিণী। দেখতে দেখতে হরিদ্বারের গঙ্গাতীর যেন প্রলয় নাচনে নেচে উঠল।

মাঝে স্বয়ং কল্কিদেব তাঁর পুত্র, ভাইপো আর বন্ধুদের নিয়ে—যেন দেবরাজ।

এমন সময় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর বেশ কিছু অনুচর নিয়ে মলিন বেশে আর এক ব্রাহ্মণ এসে কল্কিদেবকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

কল্কিদেবও যথারীতি তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আপনার পরিচয়? সঙ্গেই বা আপনার এঁরা কারা? কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক বললেন—আমি ধর্ম। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আর পরিজনদের নিয়ে আমি কলির অনুচরদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আপনারই আশ্রয়ে এসেছি। শক, কম্বোজ (সিথিয়া) শবর (গোদাবরী নদীর দুই তীরে জঙ্গলের বাসিন্দা), খশ (কাশ্মীরের পার্বত্য উপজাতি, নাম মশিয়াদ) কলির আশ্রয়ে থেকে এতই দুরন্ত হয়ে উঠেছে, এমন ম্লেচ্ছ আর বর্বর হয়ে উঠেছে যে আমরা আর থাকতে পারলাম না।

কল্কিদেব শুনে যেন মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সকলকে শুনিয়ে তিনি ধর্মকেই বললেন—চমৎকার! চমৎকার যোগাযোগ। সত্যযুগ এসে গেছে, ধর্মও এল। নিশ্চিন্ত হও ধর্ম। কলির দিন শেষ হয়ে এসেছে। মন থেকে সব বিষাদ সরিয়ে রেখে অনুচরদের নিয়ে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর। আমিও কলিকে প্রতিহত করার জন্য যাচ্ছি। এই দেখ আমার সঙ্গে

মরু, অযোধ্যার ভাবী রাজা। এই দেখ দেবাপি, হস্তিনাপুরের ভাবী অধীশ্বর।

শোনামাত্রই ধর্মের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্ত্রী আর অনুচরদের সিদ্ধাশ্রমে (হরিদ্বারে) রেখে ধর্ম যুদ্ধসাজে সাজলেন। অপূর্ব সে যুদ্ধসাজ। বেদ আর ব্রহ্ম হল তার রথ। সাতটি স্তর (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) হল সেই রথের সাত ঘোড়া। ব্রাহ্মণ হল তাঁর সারথি। ধর্মের শরাসন (তীর-ধনুক) হল নানা শস্ত্র।

সমরের আয়োজন শেষ। কল্কিদেব এবার কলির যুদ্ধের জন্য চললেন তার বিশসন নগরের দিকে। সারা নগর গোমাংসের দুর্গন্ধে ভরা। তার চারদিকে কাক, শকুন আর মাংসাশী বিকটাকার হিংস্র কুকুরের মেলা।

কল্কি সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ এসেছে শুনে কলি আক্রোশে ফুঁসে উঠল। ছেলে-নাতি, অনুচর, যে যেখানে ছিল সকলকে ডেকে বলল—কল্কির দম্ভ চূর্ণ কর। দেখে যাক কল্কি আমার শক্তি কতখানি।

বিশসন নগরে সঙ্গে সঙ্গে সাজ সাজ রব উঠল। নানা রকমের রথ এল। নানা পোশাকে যোদ্ধারা নানা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধসাজে সাজল। কলির রথের ধ্বজায় ছিল কুকুরের ছবি আঁকা পতাকা। আর ছুঁচোর ছবি আঁকা পতাকা ছিল ধর্মের। সঙ্গে সব ম্লেচ্ছ অনুচর।

দানবের মত হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ওরা নগর থেকে বেরিয়ে আসতেই কল্কিদেবের নির্দেশে ধর্ম ঋষিদের নিয়ে কলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। রাজা বিশাখযূপ পুলিন্দ আর শ্বপচদের (চণ্ডাল) সঙ্গে, মরু শক আর কম্বোজদের সঙ্গে, দেবাপি শবর আর চোলদের সঙ্গে মহারণে মেতে উঠল।

কল্কিদেব কিন্তু নিজে গেলেন কলির দুই বিশ্বস্ত অনুচর দানব কোক আর বিকোককে বধ করতে।

দেখতে দেখতে হাতির বৃংহতি, ঘোড়ার হ্রেষা, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, ধনুক-বাণের টঙ্কার, কিল-ঘুষি-চড়-এর শব্দে দিক্‌বিদিক ছেয়ে গেল। রক্তের নদী বইতে শুরু করল।

ধর্ম সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগকে নিয়ে বাণে বাণে কলির রথ ছিন্নভিন্ন করে দিল। কলি তখন গাধার পিঠে চেপে যুদ্ধ শুরু করল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কলির। ক্ষতবিক্ষত ও পর্যুদস্ত হয়ে নগরে ঢুকে মেয়েমহলে গিয়ে আত্মগোপন করল। তার অনুচরারও একে একে ধর্মের অনুচরদের হাতে পরাজিত হয়ে নগরে ঢুকে পড়ল। ওদিকে বিশাখযূপ, মরু, দেবাপির হাতে অনেক ম্লেচ্ছা মারা গেল। বাকিরা প্রাণভয়ে নগরে ঢুকে প্রাণ বাঁচলে। দুর্ভেদ্য নগর। সুতরাং নিশ্চিন্ত।

ধর্ম কিন্তু নাছোড়। সত্যযুগকে নিয়ে বিশসন নগরে ঢুকে এমন বাণ ছুড়ল যে নগরীতে আগুন লেগে গেল। পালাতে আর কেউ পারল না। কলির যত পরিজন ছিল সবাই পুড়ে মরল। কলিরও সারা গায়ে আগুনের দাহ। তাই নিয়ে তারই মধ্যে সে যে কোথায় কিভাবে পালাল, তা কেউ জানতেও পারল না।

ওদিকে কল্কিদেবও কোক-বিকোককে বধ করে একসঙ্গে এসে মিললেন।

কলির দম্ভ শেষ হল। কালও ফুরোল।

রাজা শশীধ্বজের কাহিনী

ম্লেচ্ছকুল নির্মূল করে কলিকে পর্যুদস্ত করে কল্কিদেব সসৈন্যে এসে শিবির ফেললেন ভল্লাটি নগরে (এই নগরটি সম্ভবত সহ্য পর্বতের উত্তর-পূর্ব কোণে বর্তমান ষট্‌পুরা)।

এখানকার রাজা শশীধ্বজ। সকলেই জানে, সপরিবারে রাজা পরম বৈষ্ণব। রানী সুশান্তা, দুই বীর ছেলে সূর্যকেতু ও বৃহৎকেতু, এমনকি মেয়ে রমা—সকলেই অসম্ভব বিষ্ণুভক্ত। ভগবান বিষ্ণুর পুজো, হরি গুণগান ছাড়া তাঁরা প্রায় থাকেনই না। দুর্ধর্ষ তাঁর শয্যাকর্ণ সেনারা। সকলেই রাজা শশীধ্বজের দারুণ অনুগত। এই রাজ্য সম্বন্ধে কারো মনে কোন অভিযোগই ছিল না। তবু যে কল্কিদেব কেন সৈন্য নিয়ে এ রাজ্য আক্রমণ করতে এলেন, কেউ বুঝতেও পারল না। অবতারের কাজকর্ম কি সহজে বোঝা যায়? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। হয়ত বা রাজা শশীধ্বজ ইতিমধ্যে কোন মহাপাতকের কাজ করে থাকবেন। রাজা বিশাখযূপ, মরু, দেবাপি, ধর্ম, সত্যযুগ ও সৈন্যসামন্ত কল্কিদেবের ইচ্ছাতেই রণসাজে সঙ্গে এসেছে। শুধু আদেশের অপেক্ষায়।

সসৈন্যে কল্কিদেবের আসার সংবাদ কানে যেতেই রাজা শশীধ্বজের মন আনন্দে নেচে উঠল। মনে মনে ভাবলেন স্বয়ং ভগবান তাহলে তাঁকে ভুলে যাননি। শেষে নিজেই এসেছেন। এ যে তাঁর কত বড় সৌভাগ্য! ছেলেদের ডেকে বললেন—সৈন্য সাজাও। নগরে দিগ্বিজয়ী মহাবীর

এসেছেন। মহারণ হবে। দেখিয়ে দিতে হবে, আমরাও ইচ্ছে করলে দিগ্বিজয় করতে পারি।

নগর সরগরম হয়ে উঠতে লাগল। দলে দলে সামন্ত রাজারা আসতে লাগলেন সৈন্য নিয়ে। শয্যাকর্ণ বীররা তো প্রস্তুত হয়েই আছে।

শুনে রানী সুশান্তা রাজা শশীধ্বজকে বললেন—এ কি করছ তুমি, রাজা। স্বয়ং ভগবান কল্কিরূপী বিষ্ণু এসেছেন তোমার দ্বারে। আর তুমি সকলকে হুকুম দিলে রণসাজে সাজতে? পারবে তুমি ভগবানের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে?

রাজা বললেন—জানতাম, তুমি এ কথা আমায় বলবে। স্বয়ং ভগবান হরি এসেছেন। রণক্ষেত্র ছাড়া যে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। উপায় কি? আর অস্ত্রাঘাত কোন অপরাধের নয়, রানী। আমি চললাম। দেখি, ভক্ত হারে, না ভগবান হারে। যতক্ষণ না ফিরি রানী, তুমি মন্দিরে শ্রীহরির পুজো কর, হরি গুণগান কর।

সমরায়োজন শেষ। দুই বীর পুত্রও প্রস্তুত। সমুদ্রপ্রমাণ সেনাবাহিনী, নানা অস্ত্রে সজ্জিত। মনে মনে একবার মৃদু হেসে ভগবান বিষ্ণুর নাম নিয়ে রাজা শশীধ্বজ এলেন রণক্ষেত্রে।

রণক্ষেত্রে এসেই দেখলেন, বিপুল কল্কিদেবের বাহিনী। মরু, দেবাপির মত মহারথীরা সামনে। শশীধ্বজ কালবিলম্ব না করে নিজের সেনাবাহিনীকে সবেগে চালিয়ে দিলেন। আর সেনারাও মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে কল্কিসেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেঙে তছনছ করে দিল। কল্কিসেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে রাজা বিশাখযূপ হাতির পিঠের হস্তিবাহিনী নিয়ে রাজা শশীধ্বজের মুখোমুখি হলেন। একই ভাবে কল্কিবন্ধু ধনুর্ধারী গার্গবীর শান্তকের, রাজা মরু শশীধ্বজের বড় ছেলে মহাবল সূর্যকেতুর, দেবাপি শশীধ্বজের, ষোল বছরের ছোট ছেলে গাদবিদ্ বৃহৎকেতুর মুখোমুখি হলেন। হস্তীবাহিনীর সঙ্গে হস্তীবাহিনীর, অশ্বারোহীর সঙ্গে

অশ্বারোহীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তুরী, ভেরী, শাঁখের আওয়াজে রণভূমির আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। শূল, পাশ, গদা, বাণ, ভল্ল, তোমর, ভুশুণ্ডি নামে সব অস্ত্রের আনাগোনায় আকাশ ঢেকে ঢেকে যেতে লাগল। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল। খণ্ড-ছিন্ন সেনাদের দেহ থেকে রক্ত যেন প্লাবন বইয়ে দিল।

মরু রাজার প্রখর বাণে সূর্যকেতু আহত হয়ে যেন কালানলের মত জ্বলে উঠলেন। ভীম বিক্রমে গদা হাতে এগিয়ে এসে রাজা মরুর রথের ঘোড়াগুলোকে মেরে, লাথি দিয়ে রথকে চুড়চুড় করে মরুকে নামিয়ে এনে গদা দিয়ে এমন মারলেন যে, মরু জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাই দেখে সারথি তাড়াতাড়ি মরুকে অন্য এক রথে তুলে সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

শরের পর শরেও বৃহৎকেতু যখন দেবাপিকে কায়দা করতে পারলেন না, বরং নিজের শূলাস্ত্র, শরাসন ভেঙে গেল, তখন মহাক্রোধে তিনি খাঁড়া তুলে ছুটে এলেন দেবাপির দিকে। ঘোড়া-রথ বিনষ্ট করে দিলেন। মহাক্রোধে দেবাপি বৃহৎকেতুকে প্রথমে একটা ভীষণ চড় মেরে নিজের দুই বাহুর মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, তিনি জ্ঞান হারালেন। তাই দেখে মহাবল সূর্যকেতু ছুটে এসে দেবাপির মাথায় এমন এক ঘুসি বসালেন যে, দেবাপিও সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। অনেক সেনা হারিয়ে, সেনাপতি হারিয়ে রাজা বিশাখযূপ পিছু হটে দাঁড়িয়েছেন কল্কিদেবের কাছে।

রাজা শশীধ্বজ এবার মুখোমুখি কল্কিদেবকে দেখলেন। মনে মনে ভাবলেন–আহা, কি অপরূপ ! পরনে পীত বসন, অশ্বের পিঠে বসে আছেন। গায়ের শ্যামবর্ণ ভেদ করে যেন হাজার সূর্যের জ্যোতি। টানা টানা দুই চোখ কি মনোরম ! হাতের খাঁড়া যেন ঝকমক করছে।

কিন্তু মনের এই ভাব গোপন রেখে বললেন—সবাই বলে, আপনি নাকি বিষ্ণুর অবতার। কল্কিরূপে এসেছেন অধর্মকে নাশ করতে। তা

যুদ্ধক্ষেত্রে এসে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? কই, অস্ত্র হানুন। সবাই দেখুক, শশীধ্বজের ক্ষমতা কতখানি।

শশীধ্বজের কথা শেষ হতে-না-হতেই মনে হল কল্কিদেব যেন খুব রেগে গেলেন। আর নির্বিচারে একের পর এক অস্ত্র তাঁকে হানতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্য ! সেগুলো শশীধ্বজের গায়ে যেন একটা আঁচড়ও কাটতে পারল না। অপরদিকে শশীধ্বজের ছোঁড়া কয়েকটা বাণ এসে কল্কিদেবের শরীরে আঘাত হানল। এদিকে ওদিকে তাঁর কিছুটা কেটেকুটেও গেল।

এবারে যেন মহা আক্রোশে কল্কিদেব ফুঁসে উঠলেন। মনে মনে হেসে শশীধ্বজও প্রস্তুত হয়ে নিলেন। সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে এবার মহা শক্তিশালী অস্ত্র তুলে নিলেন দুজনেই। কল্কিদেব ব্রহ্মাস্ত্র হানলেন। শশীধ্বজ ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েই তা প্রতিরোধ করলেন। কল্কিদেব এরপর এমন এক বাণ ছুঁড়লেন যেন মনে হল কোথা থেকে হাজার হাজার পাথরের চাঁই তাঁর দিকে ছুটে আসছে। শশীধ্বজ মুহূর্তে তা লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন বায়ব্য অস্ত্র। নিমেষে কোথা থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝড় এল। কি দুরন্ত সে ঝড় ! সৈন্য-সামন্ত যে যেখানে ছিল, তাদের মধ্যে কতজন যে ঝড়ের মুখে কোথায় উড়ে গেল, তার ঠিক নেই। অত বড় বড় পাথরের চাঁই থেকে কাটিয়ে আর একটুও এগোতে পারল না। বায়ব্য অস্ত্র বিফল হল দেখে কল্কিদেব এবার মোক্ষম পন্নগাস্ত্র ছুঁড়লেন। শূন্যপথে কোটি কোটি বিছে আর সাপ রাজার দিকে ছুটে আসছে। শশীধ্বজের অনুচররা ভয়ে আঁতকে উঠল। রাজা কিন্তু মৃদু হেসে শরাসন থেকে মুহূর্তে গরুড়াস্ত্র তুলে ছুঁড়লেন। ঝাঁকে ঝাঁকে সাপ-বিছের মহাশত্রু গরুড় পাখিতে আকাশ ছেয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সব। অমন মোক্ষম পন্নগাস্ত্রও বিফল হল।

কল্কিদেব হানলেন আগ্নেয়াস্ত্র। লকলকে করে যেন সারা রণক্ষেত্রে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের তাপে জ্বালায় অনেকে মারা পড়তে লাগল। আগুন বিশ্বগ্রাসী হয়ে এগিয়ে আসছে। সকলেই ভাবল, কল্কিদেব এবার বুঝি সব ধ্বংস করে দিলেন। শশীধ্বজ কিন্তু নির্বিকার। তিনি ধীরে ধীরে

তাঁর শরাসন থেকে পর্জন্য নামে এক অস্ত্র তুলে নিয়ে যেই ছুঁড়লে অমনি কোথা থেকে রণক্ষেত্রের আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল। আগুন নিভে গেল।

দিব্য অস্ত্র যা ছিল, তা সব শেষ হয়ে গেল। কল্কিদেব এবার ঘোড়া থেকে নেমে যেন সরোষে এগিয়ে এলেন লম্বা দুই হাত বাড়িয়ে শশীধ্বজের দিকে। রাজা বুঝতে পারলেন, এবার তিনি আসছেন বাহুযুদ্ধে। মনে মনে বললেন—এতক্ষণ তো এরই অপেক্ষায় ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তাঁর বাহন থেকে নেমে আস্ফালন করতে করতে যেই কাছে এগিয়ে এলেন, অমনি কল্কিদেবের এক চড়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সে চড়ের কি বিকট আওয়াজ—যেন আকাশের বুকও কেঁপে উঠল।

একটু পরেই শশীধ্বজ আবার উঠে দাঁড়ালেন। ঝাঁপিয়ে পড়লে তাঁর সব শক্তি নিয়ে কল্কিদেবের ওপর। কিলের ওপর কিল, ঘুসির ওপর ঘুসি বসাতে লাগলেন। কল্কিদেব আর সহ্য করতে পারলেন না। সকলেই দেখল, কল্কিদেব জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মনে মনে হাসলেন শশীধ্বজ। মনে মনে বললেন, 'সত্যিই তুমি খেলা দেখাতে জানো।' কল্কিদেব লুটিয়ে পড়েছেন দেখে ধর্ম আর সত্যযুগ ছুটে এসেছিলেন তাঁকে তুলে নিয়ে যাবেন বলে। শশীধ্বজ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়লেন—খবরদার! ও আমার বন্দী। আর তোমাদেরও রেহাই নেই। এই বলে ধর্ম আর সত্যযুগকে খপ্‌খপ্ করে দুই বগলে পুরে ফেললেন। হাতে তুলে নিলেন অচৈতন্য কল্কিদেবকে। তারপর মহানন্দে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। মরু, দেবাপি, বিশাখযূপ, গার্গ, কেউ আর কোন বাধা দিতে পারলেন না। হত-আহতে রণক্ষেত্র মহাশ্মশান করে যুদ্ধ শেষ হল।

রানী সুশান্তা এসবের কোন খবরই জানতেন না। তখনো তিনি বিষ্ণু মন্দিরে, প্রায় ধ্যানমগ্না। তাঁর সখীরা মহানন্দে আপন মনে সুমধুর স্বরে হরি গুণ গান গেয়ে চলেছে। রাজা শশীধ্বজ তিনজনকে সেভাবে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

রানীকে ডেকে বললেন—রানী, রানী, সার্থক তোমার পুজো, সার্থক তোমাদের নাম গান। চেয়ে দেখ, কাকে ধরে এনেছি। এই বলে ধর্ম আর সত্যযুগকে ছেড়ে দিয়ে কল্কিদেবকে তিনি মন্দির সভায় শুইয়ে দিলেন।

রানী সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এলেন। কল্কিদেবকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর তখন সে কি কান্না! বিলাপ করে উঠলেন—হায়! তুমি এ কি করেছ? ভগবান, তোমাকে কি আমায় শেষে এইভাবে দেখতে হল?

শশীধ্বজ বললেন—শুধু শুধু বিলাপ করছ রানী। যদি উনি স্বেচ্ছায় ধরা না দিতেন আমার সাধ্য কি যে বিশ্বজয়ী ভুবনস্রষ্টা ভগবানকে আমি ধরে আনতে পারি! শুধু তাই নয়, রানী। ঐ দেখ, ধর্ম আর সত্যযুগকেও ধরে এনেছি। মহানন্দে হরি গুণগান কর রানী। বুঝতে পেরেছি, ভগবান ছল করে প্রাসাদে এসেছেন গান শুনতে।

ধর্ম আর সত্যযুগ ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্তম্ভিত। এত ভক্তি! সত্যযুগের মনে হল, সত্যিই তিনি যে সত্যযুগের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ধর্মের সে কি অপার আনন্দ!

শশীধ্বজের নির্দেশে রণাঙ্গন থেকে তাঁর দুই ছেলেও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন।

দোর্দণ্ড নাম-গান চলেছে কল্কিদেবকে ঘিরে। মুর্ছিত কল্কিদেবের সামনে বসে রানী সুশান্তা তাঁর সেবা করে চলেছেন।

এক সময় চোখ মেলে তাকালেন কল্কিদেব। দেখলেন, সামনে এক রমণী। দু পাশে দাঁড়িয়ে ধর্ম আর সত্যযুগ। পেছনে রাজা শশীধ্বজ,মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে।

উঠে বসলেন কল্কিদেব। চারদিক আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে ধর্ম আর সত্যযুগকে বললেন—এ কি, আমরা রণভূমি ছেড়ে শত্রুপুরীতে কেন? কে এই রমণী আমার সেবা করছে? শত্রু শশীধ্বজই বা ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

সুশান্তা ধীরে ধীরে বললেন—ভগবানের সেবা কে না করে? তার সঙ্গে কেউ শত্রুতা করে বাঁচতে পারে?

শশীধ্বজ বললেন—আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, আপনাকে আঘাত হেনেছি ঠিকই। কিন্তু কতখানি শত্রুতা করেছি, তা কি আপনার অজানা?

ধর্ম আর সত্যযুগ বললেন—আপনার মত এমন ভক্ত আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের যে কি আনন্দ হচ্ছে!

কল্কিদেব এবার হেসে বললেন—রাজা, সত্যিই তুমি ধন্য। একমাত্র ভক্তিবলেই তুমি আমায় জয় করতে পেরেছ।

শশীধ্বজ এবার মহা সমাদরে কল্কিদেবকে রাজসভায় এনে সিংহাসনে বসালেন। মরু, দেবাপি, বিশাখযূপ, গার্গ থেকে শুরু করে কল্কিদেবের যত মহাবল ছিলেন, সেই সঙ্গে নিজ পক্ষের রাজাদেরও ডেকে আনালেন রাজসভায়।

তারপর রানীর অনুমতি নিয়ে রাজা শশীধ্বজ তাঁর অপরূপা মেয়ে রমাকে অনেক হাতি, ঘোড়া, রত্ন সেবিকা সমেত কল্কিদেবের হাতে তুলে দিয়ে সকলকে ভুরিভোজে আপ্যায়ণ করে বললেন—যাক, আমার কাজ শেষ হল। এবার আমার ছুটি। এতদিন এই ভল্লাট নগরে আমরা এরই অপেক্ষায় ছিলাম, এখন আমরা মুক্ত হলাম।

কল্কিদেব এ কথা শোনার পরও চুপ করে রমাকে পাশে নিয়ে কিছু সময় বসে রইলেন। কিন্তু রাজারা বেশ অবাক হলেন। শশীধ্বজ এসব কি বলছেন? রাজা কল্কিদেবের সঙ্গে যুদ্ধই বা করতে গেলেন কেন? এত প্রাণই বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট হতে দিলেন কেন? আবার তাঁকে জামাই করে নিজেরা 'মুক্ত হলাম' এ কথাই বা বলছেন কেন?

রাজাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

শশীধ্বজ রাজাদের নিঃসংশয় করার জন্য বললেন—সে এক বিচিত্র কাহিনী। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জন্মান্তরের ইতিহাস। আপনাদের যখন জানার ইচ্ছে হয়েছে, তখন অবশ্যই আপনাদের আমি তা বলে যাব।

হাজার যুগ আগের কথা।

মহাবনে এক শকুন আর শকুনি থাকত। পচাগলা দুর্গন্ধ মাংস খেয়ে দিন কাটাত আর এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াত।

সেই বনে এক ব্যাধ থাকত। তার একটা পোষা শকুন ছিল। সেটাকে নিয়ে সে-ও সেই বনে শিকার করে বেড়াত।

শকুন আর শকুনি একদিন ব্যাধের হাব-ভাব দেখে বুঝল, সে তাদের ধরবার চেষ্টায় আছে। তাই তাকে দেখলেই তারা পালিয়ে যেত। যেখানেই যেত, ব্যাধ কিন্তু তাদের পিছু ছাড়ত না।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে শকুন-শকুনি খিদেয় খুব কাতর হয়ে পড়েছে। কদিন ধরে তাদের আর খাওয়া জোটেনি। পচা-গলা মাংসও চোখে পড়ে না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন তারা দেখল, এক শকুন এসে নামল। তাকে দেখে শকুন-শকুনি ভাবল, নিশ্চয়ই কোন খাদ্য এসেছে, তা নইলে ঐ শকুন আসবে কেন। এই ভেবে তারাও সেই শকুনের পিছু পিছু যেই নামল অমনি ব্যাঁধের ফাঁদে পড়ল। তখন বুঝতে পারেনি যে, ওটা ব্যাধের সেই পোষা শকুন। ফাঁদে পড়ে আর পালাবার পথ নেই। ব্যাধ তাদের ধরে গণ্ডকী নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে বেশ করে জলে চুবিয়ে নিয়ে একটা শিলার ওপর আছাড় দিয়ে মারল। সেই শিলাটা ছিল আবার চক্র-আঁকা শালগ্রাম শিলা। ব্যাধ শিকারের আনন্দে খুশি। সে জানতেও পারল না শকুন-শকুনির কি মহা উপকার সে করল। নদীর জলে চোবানো আর শালগ্রাম শিলায় মারার ফলে তারা ঐ জঘন্য পক্ষী জীবন থেকে মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠধামে, যেখানে স্বয়ং নারায়ণ থাকেন।

মুক্ত জীবন নিয়ে মহাসুখে শকুন-শকুনি সেখানে একশ বছর থেকে এল ব্রহ্মলোকে। পাঁচশ বছর সেখানে মহানন্দে কাটিয়ে এল দেবলোকে। চারশ বছর দেবলোকে কাটাল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য কি তা ইতিমধ্যে তাদের জানা হয়ে গেছে। মহাজ্ঞানী হয়ে উঠেছে তারা। জেনে নিয়েছে সার কথা, কৃষ্ণ আর ভক্তি সব কিছুর মূলে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবই ঐ কৃষ্ণ। আর ভক্তি দিয়ে পাওয়া যায় না এমন কোন দুর্লভ জিনিস ব্রহ্মাণ্ডে

নেই। কোন্ কোন্ রূপে ভগবান পৃথিবীতে যাবেন অত্যাচারী-অধার্মিকদের হাত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে পৃথিবকে রক্ষা করতে, তাও তাদের জানা হয়ে গিয়েছিল।

ত্রেতা যুগের রাম আর লক্ষ্মণ দ্বাপর যুগে এলেন শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম হয়ে। তখন সেই শকুন আর শকুনিও মর্ত্যে এসে জন্ম নিল যাদব বংশে—রাজা সত্রাজিৎ আর তাঁর মহিষী হয়ে।

এই সময় এই দুই অবতারের হাতে অনেক অনুচরই মারা গিয়েছিল বটে, কিন্তু দ্বিবিদ নামে এক বানর আর জাম্ববানের মৃত্যুটা ছিল একটু অন্য ধরনের।

ত্রেতাযুগে লঙ্কাযুদ্ধে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় ঢুকে ইন্দ্রজিৎকে বধ করার পর লক্ষ্মণ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোন রকমেই তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারের বংশে দ্বিবিদের জন্ম হয়েছিল। কোন কারণে বানর হয়ে জন্মালেও সে কিন্তু চিকিৎসা ভোলেনি। কাতর লক্ষ্মণকে দেখে সে রামচন্দ্রের সামনেই তাঁকে সুস্থ করে দিলে লক্ষ্মণ খুশি মনে বলেছিলেন—দ্বিবিদ,আমি তোমার কি উপকার করতে পারি বল। দ্বিবিদ তখন বলেছিল, 'আমি এই বানর জন্ম থেকে মুক্ত হতে চাই।' লক্ষ্মণ বলেছিল, 'অপেক্ষা কর, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।' দ্বাপর যুগে সেই লক্ষ্মণই বলরামরূপে তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন।

আর জাম্ববান? সত্যযুগে বিষ্ণু যখন বামন রূপে বালির দর্প ভাঙতে তিন পায়ে ত্রিলোক জয় করেছেন, জাম্ববান তখন ক্ষিপ্রবেগে তাঁর প্রথম চরণ এক পাক ঘুরে নিয়েছিল। তাই দেখে বানরদের বলেছিলেন, 'তোমার দ্রুততা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। বল, কি চাও? জাম্ববান প্রার্থনা জানিয়েছিল, 'আমি এই পশুজন্ম থেকে মুক্তি পেতে চাই।' বামনদেব তাকে আশ্বাস দিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। দ্বাপরযুগে সেই জাম্ববান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্ত হয়েছিল একটা স্যমন্তক মুনির ব্যাপার নিয়ে। আর তার পিছনে ছিল সেই রাজা সত্রাজিৎ।

সূর্যদেব সত্রাজিতকে দিয়েছিলেন সেই স্যমন্তক মণি। মণিটি সত্রাজিৎ

শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে রেখেছিল তার ভাই প্রসেনের কাছে। শিকারে গিয়ে প্রসেন প্রাণ হারায়। মণিটাও খোয়া যায়। সত্রাজিতের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সবই কৃষ্ণের কারসাজি। লোভী কৃষ্ণই তার ভাইকে মেরে মণিটা নিয়েছে। কৃষ্ণ কিন্তু সত্রাজিতের ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন। জাম্ববানকে মেরে সেই মণি উদ্ধার করে এসে সত্রাজিতকে ফেরত দিয়েছিলেন। ভগবান কৃষ্ণের নামে কলঙ্ক রটানোর ফলে সত্রাজিৎ তখন মনে মনে খুব আপসোস করেছিল। আর ব্যাপারটা সহজ করে নেবার জন্য তার মেয়ে সত্যভামাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিয়েছিল।

(ভাগবত পুরাণ ঃ স্যমন্তক মণির রহস্য কাহিনী)।

ভগবানের নামে অপবাদ, ভগবানে মুহূর্তের জন্য অবিশ্বাসের পাপ কিন্তু সত্রাজিতকে ছাড়েনি। মুক্ত জীবন নিয়ে লোকান্তর ঘুরতে ঘুরতে সেই শকুন–শকুনির জানা হয়ে গিয়েছিল কলিযুগে ভগবান কল্কিদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।

তাই প্রাচীন সেই শকুন–শকুনিকে, দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ ভক্ত সত্রাজিৎ আর সত্রাজিৎ মহিষীকেও পাপমোচন করার জন্য, মুক্ত হওয়ার জন্য কলিযুগে জন্মাতে হল।

এরপর একটু থেমে শশীধ্বজ বলেন—রাজাগণ, আমিই সেই শকুন বা সত্রাজিৎ, আর রানী সুশান্তাই হলেন সেই শকুনি সত্রাজিৎ-মহিষী। গত জন্মের সন্দেহ ভগবান কল্কিদেবের ওপর এ জন্মে আমাদের আর নেই। তখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিটমাট করার জন্য সত্যভামাকে দিয়েছিল সত্রাজিৎ। সেই সত্যভামা এ জন্মে আমার মেয়ে রমা। এ জন্মে তাঁকে আজ ভগবানের হাতে সমর্পণ করে মুক্ত হলাম। আর লোকক্ষয়! যারা মরছে, তারা সবাই ছিল অধার্মিক।

শশীধ্বজের কাহিনী শুনে বিস্ময়ে সকলে হতবাক হয়ে গেলেন।

—ভগবানের কৃপাতেই আমি জাতিস্মর হয়েছিলাম। তাই সব বলতে পারলাম। এবার আমার ছুটি। এই বলে কল্কিদেবের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে শশীধ্বজ হরিদ্বারে চলে গেলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গল্প

বিষ্ণু এবং শিব, অর্থাৎ হরি এবং হর এঁরা কি দু-জন আলাদা কেউ? নামে আলাদা, আসলে কিন্তু এক। যিনি শিব তিনিই বিষ্ণু, যিনি হরি তিনিই হর—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অসংখ্য কাহিনীর মধ্য দিয়ে বারবার সেই কথাই বলেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান ভগবান, তিনিই প্রথমে এই তত্ত্বকথা গোলোকে বসে ব্রহ্মাকে শুনিয়েছিলেন। ব্রহ্মা সেই কথা শুনিয়েছিলেন ধর্মকে। ধর্ম তাঁর ছেলে নারায়ণকে এই রহস্যকথা জানিয়েছিলেন। নারায়ণ আবার তা বলেছিলেন ভক্ত নারদকে। নারদমুনি গঙ্গার ধারে বসে সেই পুরাণ-কথা বলেছিলেন ব্যাসদেবকে। ব্যাসদেবের শিষ্য পুরাণবক্তা রোমহর্ষণ সূত এই পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন নৈমিষারণ্যে ঋষিদের কাছে। এই পুরাণে চারটি খণ্ড: ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড আর শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। বেশ কিছু বিচিত্র কাহিনী যেমন এতে আছে, তেমনি একমাত্র এই পুরাণেই রাধার কাহিনী পাওয়া যায়।

নারদের ইতিকথা

সুবিশাল জলরাশি সরিয়ে প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি করলেন স্থাবর-জঙ্গম। জেগে উঠল মাটি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত। মহাপ্লাবনের পর আবার সব কিছু নিয়ে জেগে উঠল পৃথিবী। এবার প্রজাসৃষ্টির পালা। এই বিপুল সম্পদ দিয়ে পৃথিবী পালন করবে কাকে।

অনেক ভেবেচিন্তে ব্রহ্মা তখন প্রথমে নিজেই সৃষ্টি করলেন কয়েকজন মানস-পুত্র। বললেন তাঁদের—এই দিব্য দেহ নিয়ে তোমরা আমার এই পৃথিবীকে প্রজা দিয়ে সাজিয়ে তোল। তোমরা এক-একজন প্রজাপতি হও।

এই মানস-পুত্রদের মধ্যে কয়েকজন রাজি হলেন বটে, কিন্তু কয়েকজন আবার বেঁকে বসলেন। যাঁরা বেঁকে বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নারদ।

ব্রহ্মার মুখের ওপর তিনি সোজা বলে বসলেন—ঘর-সংসার করার কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—আমি তোমার স্রষ্টা, তোমার বাবা, তোমায় বলছি। তুমি তা অবজ্ঞা করবে? মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন ব্রহ্মা।

—বললে কি হবে। যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তা কি জোর করে করা যায় নাকি? তুমি আমাকে নামগান করতে বল, রাজি আছি। কিন্তু ওসব আমার দ্বারা হবে না, সাফ কথা। বললেন নারদ।

শুনে ব্রহ্মা গেলেন রেগে—কি, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা? যা, তুই

গন্ধর্বকুলে জন্মা গে। রাগের চোটে ব্রহ্মা নিজের ছেলেকেই দিয়ে বসলেন অভিশাপ।

নারদও কিছু কম ছিলেন না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখের ওপরই বাবাকে দিয়ে বসলেন অভিশাপ—বিনা অপরাধে তুমি আমায় অভিশাপ দিলে? তাহলে তুমিও শুনে রাখ, পৃথিবীতে তোমার পুজো কেউ করবে না।

[প্রায় সব দেবতারই পুজো হয় মূর্তি করে। কিন্তু ব্রহ্মার পুজো নেই বললেই হয়]।

অভিশাপের তীর দিয়ে বিঁধল দু-জনকেই। ব্রহ্মার না হয় পুজো হবে না, কিন্তু নারদের?

সব কিছু থাকতেও গন্ধর্বরাজের মনে কোন শান্তি ছিল না। কেননা, তাঁর কোন ছেলেপুলে ছিল না। এই বিশাল রাজত্ব ভোগ করবে কে?

রাজাকে বিমর্ষ দেখে গুরুদেব বললেন—গন্ধর্বরাজ, তুমি বরং পুষ্কর তীর্থে গিয়ে তপস্যা কর। আমার বিশ্বাস, তাহলে এই অভাব তোমার আর থাকবে না।

পুষ্কর তীর্থে গেলেন গন্ধর্বরাজ। দেখা বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে। মুনিবর তাঁকে বললেন, শিবের তপস্যা করতে।

পুত্র চাই। সুতরাং যে কোন তপস্যাই হোক, আর যত কষ্টেরই হোক, তিনি তা করতে রাজি।

নিশ্চল হয়ে গন্ধর্বরাজ বসলেন পুষ্কর তীর্থে শিবের আরাধনায়। প্রায় যখন একশটা বছর কেটে গেল, মহাদেব এসে দেখা দিলেন তাঁকে। বললেন—গন্ধর্বরাজ, আমি সন্তুষ্ট তোমার তপস্যায়। বল, কি তোমার প্রার্থনা।

প্রণাম জানিয়ে গন্ধর্বরাজ বললেন—ভগবান, আমার দুটি মাত্র প্রার্থনা। অপুত্রক আমি, মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি। একটি পুত্র আমায় দিয়ে আমার দুঃখ দূর করুন। আর একটি প্রার্থনা। আপনি তো জানেন, শ্রীহরি আমাদের কত প্রিয়। আমার পুত্রও যেন তাঁর দাস হয়ে তাঁরই নামগান করে!

মহাদেব বললেন—পুত্র চেয়েছ। আমার বরে নিশ্চয়ই তোমার রূপবান, গুণবান পুত্র হবে। কিন্তু শ্রীহরির দাস হবে সে, এ যে দারুন

প্রার্থনা। যদি বল, তোমার ছেলে ইন্দ্র হবে, ব্রহ্মা হবে, সেটা পূরণ করা যেতে পারে, কিন্তু...

গন্ধর্বরাজের কিন্তু ঐ এক কথা। হরিভক্ত ছেলে না হলে তিনি প্রাণ দেবেন।

অগত্যা মহাদেব মঞ্জুর করে গেলেন গন্ধর্বরাজের প্রার্থনা।

মহাখুশি গন্ধর্বরাজ ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

যথাসময়ে একটি পুত্রও হল। যেমনটি বলেছিলেন মহাদেব, ঠিক তেমনটি। যেমন রূপবান, তেমনি গুণবান—যেন এক দেবদূত।

গন্ধর্বলোকে মহা ধুমধাম। রাজার ছেলে হয়েছে শিবের বরে, এ কি কম কথা? বশিষ্ঠদেব তাঁর নাম রাখলেন উপবরহণ।

শিশু উপবরহণ দেখতে দেখতে হলেন শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক। তাঁর রূপে-গুণে-গানে গন্ধর্বলোক যেন পেল নতুন প্রাণ। হরির গুণগানে গন্ধর্বলোক যেন পাগল হলে উঠল।

চিত্ররথ নামে ছিলেন আর এক গন্ধর্বরাজ। গণ্ডকী নদীর জলে একদিন স্নান করতে গিয়ে তার মেয়েরা যুবক উপবরহণকে দেখে সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করে বসল তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তারা।

প্রস্তাব পাঠালেন চিত্ররথ গন্ধর্বরাজের কাছে। পঞ্চাশটি মেয়ে তাঁর। বিয়েও হয়ে গেল। হরিভক্ত ছেলে তাঁর পত্নীদের নিয়ে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

একসময় গন্ধর্বরাজ ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে নিজে অবসর নিলেন।

গন্ধর্বলোকের রাজা এখন উপবরহণ।

গন্ধর্ব হয়ে জন্মালেও উপবরহণ কিন্তু জন্মান্তরের কথা ভুলতে পারেন নি। বিয়ে করে সংসারি হয়েও কিন্তু সংসারে একেবারে জড়িয়ে না পড়ে, কাঁধে তিনতারের বীণা আর গলায় স্ফটিকের মালা পরে সর্বত্র শ্রীহরির গুণগান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন এমনিভাবে গান গাইতে গাইতে পত্নী মালাবতীকে নিয়ে উপবহরণ গিয়ে হাজির পুষ্করতীর্থে।

সেখানে গিয়ে দেখেন রাজ্যের দেবতারা বসে আছেন এক আসর আলো করে। স্বয়ং ব্রহ্মাও বসে আছেন সেখানে একটা উঁচু আসনে। আর অপ্সরা রম্ভা এমন নাচ নাচছে, যে দেবতারা মোহিত, আর ব্রহ্মাও বেশ মেজাজে তা উপভোগ করছেন।

উপবরহণ এসে ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে একপাশে দেবতাদের কাছে গিয়ে বসলেন। অপ্সরী রম্ভার সেদিকে খেয়ালই নেই।

নাচ দেখতে দেখতে একসময় যুবক উপবরহণ নিজেকে আর সংযমের মধ্যে রাখতে না পেরে এমন এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসলেন যা দেখে দেবতারা হেসে উঠলেন, আর দারুণ রেগে উঠলেন ব্রহ্মা নিজে।

এমন নাচের আসর উপবরহণের জন্য ভেঙে গেল। রাগ তো তাঁর হবারই কথা। উপবরহণও কিন্তু কম লজ্জায় পড়লেন না। কিন্তু যা হবার তা তো হয়ে গেছে—উপায় কি?

ব্রহ্মা আবার অভিশাপ দিলেন—শ্রীহরির নাম-গান করছ অথচ কামনাকে জয় করতে পারলে না। আমার অভিশাপে জন্ম নিয়েছিলে গন্ধর্বের ঘরে। এখন যে কাজ করলে এর জন্য তুমি শূদ্রের ঘরে গিয়ে জন্মাবে, যাও।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন উপবরহণ।

—দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও—ধমক দিয়ে ওঠেন ব্রহ্মা। তুমি ছিলে আমার মানস-পুত্র। দেখছি তুমি আমার কলঙ্ক। আবার তুমি যদি কোন বিষ্ণু-ভক্তের সঙ্গ পাও, তবেই শাপমুক্ত হবে।

অপমানে লজ্জায় গন্ধর্ব উপবরহণ ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে, এ মুখ তিনি আর কাকে দেখাবেন। সোজা চলে এলেন নির্জন এক উপবনে। বীণাটিকে পাশে রেখে, বাঁ হাতে স্ফটিকের মালা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে যোগাসনে বসলেন তিনি। দেহত্যাগ করবেন। করলেনও তাই। এক সময় যোগবলে দেহত্যাগ করে চলে গেলেন তিনি।

মালাবতী খুঁজতে খুঁজতে সেই উপবনে এসে স্বামীর মৃত্যু দেখে তো কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আর সব রানীরাও কাঁদতে কাঁদতে এসে আছড়ে পড়ল। গন্ধর্বরাজ শুনে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। হবারই কথা। অনেক তপস্যায় পাওয়া অমন গুণী ছেলে তাঁর—অকালে চলে গেল!

অকালে অমন স্বামীর মৃত্যু কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে? সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেল মালাবতী। আকুল হয়ে সে ডাকতে লাগল শ্রীকৃষ্ণকে। ডাকতে লাগল ধর্ম, ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সব দেবতাদের—কি অপরাধ আমার স্বামী করেছে ভগবান যে অকালে তোমরা তাঁর প্রাণ নিলে ? দয়া করে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে দাও।

মৃত স্বামী উপবরহণের মাথা কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর প্রার্থনা জানাতে জানাতে কেটে গেল গোটা দিন-রাত।

এল পরের সকাল। এত প্রার্থনা তার বিফল হল দেখে মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ন হয়ে উঠল সে।

দেবতাদের উদ্দেশ করে এবার মালাবতী প্রায় গর্জন করে উঠল—শোন

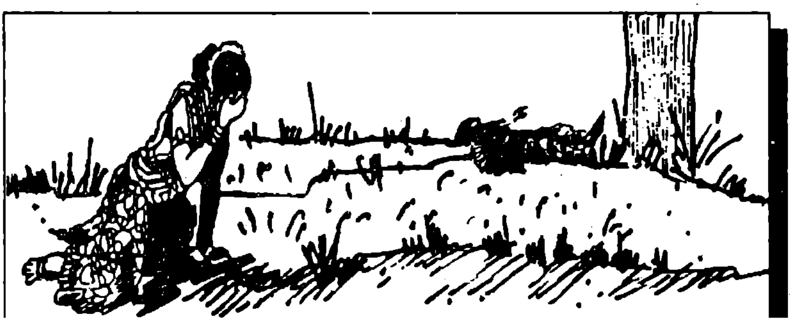

দেবগণ, আমি যদি সতী-সাধ্বী হই, যদি আমি আমার স্বামীকেই একমাত্র দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে থাকি, তাহলে আমি তোমাদের অভিশাপ দেব। আমার অভিশাপে তোমরা দেবতারা, আমার কাছ থেকে বিনা অপরাধে অসময়ে আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে যে অপরাধ করেছ, তার ফল তোমাদের ভোগ করতেই হবে। যদি দেখতাম, স্বামী আমার বৃদ্ধ হয়েছেন, রোগগ্রস্ত হয়ে মারা গেছেন, তাহলে অবশ্যই আমার বলার কিছু থাকত না। কিন্তু কেন তোমরা অকালে আমার এই বিপর্যয় ঘটালে! আমার প্রার্থনাও তোমরা শুনলে না। দেখ, আমিও তোমাদের কি করতে পারি।

এই বলে মালাবতী মৃত স্বামীকে রেখে চলে গেল কৌশিকী নদীতে।

এদিকে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে দেবতারা যখন মালাবতীকে রেগে-মেগে নদীর জল হাতে নিয়ে তাঁদের অভিশাপ দেবার জন্য কৌশিকীর দিকে যেতে দেখলেন, তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। খুব ভয় পেয়ে গেলেন। সতী-সাধ্বী মালাবতী যদি একবার অভিশাপ দিয়ে বসে, তাঁদের সাধ্য নেই যে তা রোধ করেন। আবার এদিকে যে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে মান বাঁচাবেন, তাও না পেরে সকলে মিলে যুক্তি করে ছুটলেন ক্ষীরসাগরে ভগবান বিষ্ণুর কাছে।

বিষ্ণু তো আর সহজে দেখা দেন না কাউকে। অথচ এই ঘোর বিপদ থেকে একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া তাঁদের রক্ষা করার আর কে আছেন? ক্ষীরসাগরে স্নান সেরে তাই ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম থেকে শুরু করে দেবতারা আরম্ভ করলেন তাঁর স্তব-স্তুতি।

অনেকক্ষণ স্তব-স্তুতি করার পর একসময় শুনলেন তাঁরা দৈববাণী—দেবগণ, তোমরা মালাবতীর কাছে যাও। উপায় একটা অবশ্যই হবে।

দৈববাণী শুনে দেবতারা তো তাড়াতাড়ি চলে এলেন উপবনের ধারে সেই কৌশিকী নদীতে।

সবেমাত্র স্নান সেরে হাতে জল নিয়ে দেবতাদের অভিশাপ দিতে যাবে মালাবতী, এমন সময় হঠাৎ দেবগণকে দেখে উঠে এল জল থেকে। বলল—তাহলে এতক্ষণে আপনারা এলেন? বলুন....বলুন, আপনারা আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন কিনা।

মালাবতীর এক চোখে জল, এক চোখে আগুন। মুখে পরিষ্কার দাবি। কি জবাব দেবেন তাঁরা মালাবতীকে! ভগবান বিষ্ণু আড়াল থেকে বলেছেন এখানে তাঁদের আসতে। উপায় তিনি করে দেবেন। কিন্তু কোথায় তিনি? মালাবতীর সামনে থেকে সরে যাবারও তো কোন উপায় নেই এখন। বেশ বিব্রত বোধ করতে শুরু করলেন দেবতারা। এদিকে মালাবতীর সেই একই কথা—বলুন, আপনারা আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন কিনা। বলুন... বলুন...।

ঠিক সেই সময়ে কপালে চন্দনের তিলক, বগলে পুঁথি নিয়ে সেখানে এলেন এক ব্রাহ্মণ যুবক। যেমন সুদর্শন, তেমনি সৌম্যকান্তি। তাঁকে দেখলেই মনে জাগে শ্রদ্ধা।

—কি ব্যাপার, এখানে? ব্রহ্মা, শিব, ধর্মরাজ! কি হল! সব এখানে কেন? বলতে বলতে সেই ব্রাহ্মণ যুবক একেবারে এসে দাঁড়ালেন মালাবতীর সামনে।

মৃত স্বামীকে সামনে কোলে নিয়ে মালাবতী তখনো দেবতাদের কাছে তার আবেদন পেশ করে চলেছে।

—কে তুমি? কাকে কোলে নিয়ে এভাবে কাঁদছ? মৃত বলে মনে হচ্ছে? তোমার স্বামী বুঝি? কি হয়েছিল? একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করে বসলেন সেই ব্রাহ্মণ যুবক মালাবতীকে।

অবাক চোখে তাকায় মালাবতী ব্রাহ্মণ যুবকের দিকে। দেবতারাও তাঁকে দেখলেন বিস্ময়ের চোখে।

মালাবতীকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে ব্রাহ্মণ যুবক বললেন—শোন মেয়ে, আমার কাছে কিচ্ছু গোপন করো না। খুলে বল কি হয়েছে? আমি একজন কবিরাজ। আমি মরাকেও বাঁচিয়ে তুলতে পারি। সে চিকিৎসাবিদ্যা আমার জানা আছে। কি রোগে মরেছে তোমার স্বামী? তুমি নিঃসঙ্কোচে বল।

শুনে যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল মালাবতী।

বলল—ইনি আমার স্বামী গন্ধর্বরাজ উপবরহণ। আমি মালাবতী, চিত্ররথ গন্ধর্বের মেয়ে। আমার পঞ্চাশ বোনের ইনি স্বামী। কোন রোগে

ইনি মারা যান নি। দেহত্যাগ করেছেন অকালে ব্রহ্মার অভিশাপে।

—তা ব্রহ্মা হঠাৎ তোমার স্বামীকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন কেন?

মালাবতী তখন সবই খুলে বলল ব্রাহ্মণ যুবককে।

শুনলেন তিনি। তারপর তাকালেন ব্রহ্মার দিকে।

ব্রহ্মা বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে মালাবতী। ও ছিল আমার মানব-পুত্র নারদ। আমার আদেশ অমান্য করেছিল বলে আমারই অভিশাপে গন্ধর্বকুলে জন্ম নিয়েছিল। হরিভক্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু কামনা জয় করতে পারে নি বলেই অভিশাপ দিয়েছিলাম শূদ্রকুলে জন্ম নেবার। সেই দুঃখেই উপবরহণ দেহত্যাগ করেছে। তবে একথা ঠিক যে, এখনও ওর মৃত্যুর সময় আসে নি। আয়ু এখনও আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মালাবতী ব্রাহ্মণ যুবককে বলে উঠল—আয়ু থাকতেও আমার স্বামী দেহত্যাগ করল মনের দুঃখে, অকালে। তা জেনেও কোন অধিকারে যমরাজ আমাদের অনাথ করে তাঁর প্রাণকে নিয়ে গেল?

—খুব খাঁটি কথা, বললেন ব্রাহ্মণ যুবক—দারুন দামি কথা বলেছে মালাবতী। ধর্মরাজ, তুমি এর কি জবাব দেবে? যমকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন ব্রাহ্মণ যুবক।

—আমি তো নিজের ইচ্ছেয় নিয়ে যাই নি। নিয়তি এনে দিয়েছে, আমি আমার অধিকারে তবে তাকে পেয়েছি। আমার কি অপরাধ বল ব্রাহ্মণ? বললেন যমরাজ।

—নিয়তি? মানে, মৃত্যুকন্যা? বলল মালাবতী—ব্রাহ্মণ, দেখছি আপনি অনেক শক্তি ধরেন। আমার সামনে একবার সেই মৃত্যুকন্যাকে হাজির করতে পারেন? তাকে জিজ্ঞেস করব, মেয়ে হয়ে সে কি মেয়ের কষ্ট বোঝে না?

ব্রাহ্মণ যুবক মালাবতীর অনুরোধমত ডাকলেন মৃত্যুকন্যাকে।

মৃত্যুকন্যা আসতেই মালাবতীর কথা শুনে শুধু বলল—ব্যাথা আমি বুঝি মেয়ে, কিন্তু আমি যে নিরুপায়। কালের আদেশ উপেক্ষা করার ক্ষমতা যে আমার নেই, মেয়ে।

ডাক পড়ল কালের। তিনি বললেন—দেখ মেয়ে, আমি আমার ইচ্ছেয় চলি না। ভগবান বিষ্ণুই আমাদের প্রভু। তিনি যা করান, আমরা তাই করি।

—কিন্তু আমার স্বামীর আয়ুষ্কাল তো শেষ হয় নি, কাল? তবু তুমি তাকে নিয়ে যাও কোন্ অধিকারে? ফুঁসে ওঠে মালাবতী।

কাল কি উত্তর দেবে এর?

মুখ শুকিয়ে গেল দেবতাদের। দৈববাণীতে ভগবান বিষ্ণু বলেছিলেন, 'উপায় একটা হবে।' এখন কি উপায়? কোথায় তিনি?

মুখ আড়াল করে মুচকি হাসলেন ব্রাহ্মণ যুবক। মনে মনে আরও মজা পেলেন এই ভেবে যে, এমন দারুণ ছদ্মবেশ ধরেছেন তিনি, যে দেবতাদেরও সাধ্য হল না তাঁকে চেনবার।

ব্রাহ্মণ যুবক তখন দেবতাদের ডেকে বললেন—মালাবতী তো খুব খারাপ কথা বলে নি, দেবগণ। কি ভাবছেন এখন? সতী-সাধ্বী রমণীর অভিশাপ তো বিফলে যাবে না। রোগ-বালাইয়ে মরলে না হয় দেখতাম। কিন্তু, এখানে আমারও যে আর কিছু করার নেই।

মালাবতীর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভগবান এ কি পরীক্ষায় ফেললেন তাঁদের। মাথা চুলকোতে লাগলেন ব্রহ্মা থেকে সব দেবতা।

ব্রহ্মা শেষে বললেন—কি আর করব, জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে কমণ্ডলুর জল গায়ে ছিটিয়ে দিতেই চোখ মেলে তাকাল উপবরহণ।

শিব, পবন, আদিত্যও তাঁদের যেটুকু যা দেবার দিতে উঠে বসলেন তিনি। দাঁড়ালেন। তাকালেন চারদিকে। মালাবতীর মনও খুশিতে ভরে উঠল।

সবই ফিরে পেলেন বটে গন্ধর্ব উপবরহণ। কিন্তু কাউকে চিনতে পারছেন না কেন? সেই স্বাস্থ্য, সেই সৌন্দর্য—তবু এমন জড়ভরতের মত অবস্থা কেন হল?

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মালাবতী। আহ্বান জানাল ব্রহ্মাকে।

ব্রহ্মা বললেন—আমাদের যার যা করার, সবই তো করেছি মালাবতী। তোমার স্বামীর জীবন আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন এমন হল? তুমি বরং ঐ কবিরাজ ব্রাহ্মণ যুবককে ডেকে দেখাও।

কিন্তু কোথায় সেই কবিরাজ। তন্ন তন্ন করেও তাঁকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

চোখ খুলে গেল দেবতাদের। বুঝতে পারলেন, সেই ব্রাহ্মণ যুবক আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। মালাবতীকে বললেন ব্রহ্মা—ভগবান বিষ্ণুকে ডাক মালাবতী। তিনি না দিলে, আমাদের দেওয়াটা এরকমই থেকে যাবে।

মালাবতী তখন একমনে শুরু করল ভগবান কৃষ্ণেরস্তব। ফিরিয়ে আনল উপবরহণের প্রাণ। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন গন্ধর্বরাজ। গন্ধর্বনগরীতে আবার উঠল আনন্দের রোল।

মনের আনন্দে হরিভক্ত গন্ধর্ব উপবরহণ এরপর কাটালেন তার বাকি জীবন নাম-গান করে।

তারপর একদিন নেমে এল স্বাভাবিক মৃত্যু। মারা গেলেন উপবরহণ। জ্বলে উঠল চিতার আগুন। স্বামীর চিতায় মালাবতীও প্রাণ দিল।

ব্রহ্মার অভিশাপ কিন্তু বৃথা যাবার নয়।

কান্যকুব্জে ছিলেন গোপরাজ দ্রুমিল। তাঁর স্ত্রী কলাবতী। সংসারে তাঁর সবই ছিল। ছিল না শুধু ছেলে। তাই দুঃখ অনেক।

বহু সাধ্য-সাধনা করেও দ্রুমিলের যখন কোন ছেলে হল না, তখন পুত্র কামনায় কলাবতী স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে একদিন গেল কাছেই কাশ্যপ মুনির আশ্রমে। ব্রহ্মতেজে জ্বলজ্বল করছে মুনির সারা অঙ্গ। ধ্যানমগ্ন।

কলাবতী প্রণাম করে বসল তাঁর সামনে।

ধ্যান শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই মুনিবরের চোখে পড়ল কলাবতীকে।

সুন্দরী সুবেশা কলাবতী কাশ্যপের দিকে তাকিয়ে এমন একটা হাসি হাসল, আর এমনভাবে চাইল যে, মুনিবর চমকে উঠলেন।

মাথায় সিঁদুর—নিশ্চয়ই কারো স্ত্রী। কিন্তু এ কি হাবভাব?

দেখে খুবই রেগে উঠলেন কাশ্যপ।

—কি চাই তোমার এখানে? কি করতে এসেছ? যাও,' এখান থেকে।

কলাবতী কোন সঙ্কোচ না করে সরাসরি বলে বসল—মুনিবর! আপনার কাছে এসেছি মাত্র একটি পুত্রের জন্য।

শুনে কাশ্যপ তো উঠলেন আরো রেগে। তার আশ্রম কি কোন অনাচারের জায়গা? এত সাহস পেল কোথা থেকে এই মেয়ে!

ঠিক সেই সময়েই স্বর্গের অপ্সরা মেনকা যাচ্ছিল সে পথ দিয়ে। যাকে দেখলে দেবতারা সংযম হারান, সেখানে মুনি তো কোন ছার!

কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। মনের আনন্দে কলাবতী ফিরে এল বাড়িতে। স্বামী দ্রুমিলও শুনে মহা খুশি। এতদিনে তার দুঃখ অবশ্যই ঘুচবে। তার কুলে যে সন্তান জন্মাবে, তার কোন তুলনা থাকবে না।

দ্রুমিল মনের আনন্দে চলে গেল বদরিকা আশ্রমে। তার ইচ্ছা, তপস্যায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কলাবতীকে বলল—তুমি কোন ব্রাহ্মণের ঘরে থেকে তোমার ভাবী সন্তানকে দেখো, কলাবতী। আমার কাজ শেষ। আমি এবার আমার এ জীবন ত্যাগ করব।

করলও তাই।

কলাবতীও স্বামীর মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবে কি, এক ব্রাহ্মণ এসে কোথা থেকে হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে বসলেন।

বললেন—মা, এ তুমি কি করছ? তোমার পেটে ছেলে রয়েছে।

কলাবতী বলল—জানি, তা তুমি কে বাবা? বলতে পার আমার কি উপায়? আমার স্বামী তপস্যায় প্রাণ দিলেন। কার কাছে আমি থাকব? কি হবে আমার ছেলের পরিচয়?

ব্রাহ্মণ বললেন—আমার ঘরে চলুন। সেখানে আপনি আমার মা হয়ে থাকবেন। ছেলেটি হবে আমার ভাই।

এড়াতে না পেরে কলাবতী অগত্যা গিয়ে উঠল সেই ব্রাহ্মণের ঘরে।

সেখানেই একদিন জন্ম হল এক শিশুর।

ব্রাহ্মণ ছিলেন খুবই সদাচারী। দারুন কৃষ্ণভক্ত। বৈষ্ণবরা প্রায়ই

আসতেন তাঁর বাড়িতে। নাম-গান হত। ভগবানের আলোচনা হত। কলাবতী তাঁদের সাধ্যমত সেবা-পরিচর্যা করত।

ছেলেটির নাম রাখল ব্রাহ্মণ নারদ। কারণ যেদিন ছেলেটি জন্মেছিল সেদিন নাকি খুব বৃষ্টি হয়েছিল দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর।

শিশুটি কিন্তু ছিল জাতিস্মর। পূর্বজন্মের সব কথা তার মনে ছিল। তাই প্রথম থেকেই এমন আচার-আচরণ করতে শুরু করল যে, ব্রাহ্মণ দেখে অবাকই হন। পাঁচ বছর যখন তার বয়স হল, তখন নারদ যেন আর এক 'নারদ'। সাধু-সন্ত এলে কিছুতেই তাদের কাছছাড়া হত না। যেখানে কৃষ্ণের নাম-গান বা পুরাণ পাঠ হত, সেখান থেকে তুলে আনে সাধ্য কার? নিজের মনেই মাটি দিয়ে মনের মত করে কৃষ্ণের মূর্তি গড়ে ধুলোর নৈবেদ্য সাজিয়ে গান গেয়ে তার পুজো করত। মা কলাবতী খেতে ডাকলে বলত—দাঁড়াও মা, পুজোটা শেষ করি।

একদিন চারজন ব্রাহ্মণ এলেন সেই ব্রাহ্মণের বাড়ি। যথোচিত সমাদর জানালেন ব্রাহ্মণ। নারদ নিল তাঁদের সেবার ভার। দিনরাত পড়ে থাকে তাঁদের কাছে। শোনে ভগবানের কত কথা। ব্রাহ্মণরা খান ফলমূল। নারদ খায় তার প্রসাদ। দেখতে দেখতে নারদের মনও কেমন উদাসীন হয়ে উঠতে থাকে। ইচ্ছে জাগে, চলে যায় এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। কিন্তু পারে না মায়ের জন্য।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। সর্পাঘাতে মারা গেল কলাবতী। যেটুকু বন্ধন ছিল নারদের, তাও কেটে গেল।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণরা চলে যাবার আগে নারদকে দিয়ে গেল বিষ্ণুনাম। নারদও গঙ্গার তীরে গিয়ে বসল সেই নাম জপ করতে।

কত বছর যে জপ করতে করতে কেটে গেছে তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন ধ্যানমগ্ন নারদ দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রাণের ঠাকুর। শ্যাম কলেবর, হাতে মোহন বাঁশি। দেখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল তার।

কিন্তু পরক্ষণেই কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেই মূর্তি।

হাহাকার করে উঠল নারদ।

এমন সময় হল দৈববাণী—আর তুমি এখন আমায় দেখতে পাবে না।

কেঁদে আকুল নারদ। বলল—আর যদি দেখা না দেবে, তবে এলে কেন?

—তোমার তৃষ্ণা বাড়াবার জন্য। হল দৈববাণী—শীঘ্রই তোমার মুক্তি হবে, অপেক্ষা কর। স্থির চিত্তে তপস্যা কর নারদ। তোমার এ জীবন শেষ হলে দিব্য জীবন পাবে। তখন তুমি থাকবে আমারই কাছে।

তপস্যায় শূদ্র জীবন শেষ করে নারদ আবার ফিরে পেলেন তাঁর প্রথম সেই দিব্য জীবন। ফিরে এলেন তিনি আবার ব্রাহ্মলোকে। খুব আনন্দ তাঁর মনে। নারদ তো আর জানতেন না, এরপরেও তাঁর জন্য আরও কি অপেক্ষা করে আছে!

পিতাকে এসে প্রণাম করতেই ব্রহ্মা বললেন—নারদ তোমার শাপমুক্তি ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু কর্মফল যে তোমাকে এখনও ভোগ করতে হবে।

—তার মানে? চমকে ওঠেন নারদ।

—গন্ধর্ব জীবনে যে মালাবতীকে তুমি বিয়ে করেছিলে সে এখন জন্ম নিয়েছে সঞ্জয়রাজের ঘরে। রূপগুণশালিনী মেয়ে। মালাবতী চিতায় আত্মাহুতি দেবার সময় একটাই মাত্র কামনা নিয়ে প্রাণ দিয়েছিল, পরজন্মে সে যেন তোমাকেই স্বামী হিসেবে পায়। এখনও সে তোমারই অপেক্ষায় রয়েছে। বললেন ব্রহ্মা।

—এত কাণ্ড করে ফিরে এলাম, আবার তুমি আমাকে বিয়ের কথা বলছ? তুমি তো জান, ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। বললেন নারদ।

—তাই বলে তুমি সে মেয়ের তপস্যাকে উপেক্ষা করতে পার না। বললেন ব্রহ্মা।

রাগ করে নারদ সেখান থেকে সোজা চলে গেলেন বদরিকা আশ্রমে, যেখানে ভগবানের অংশ নারায়ণ ঋষি তপস্যা করছিলেন।

অনেক আলাপ-আলোচনা, অনেক জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে সঞ্চয় করলেন বটে নারদ, কিন্তু শেষে সেই ফাঁদে পড়লেন।

নারায়ণ বললেন—নারদ, সঞ্জয়রাজের কন্যাকে বিয়ে কর গে। শিবের তপস্যা করে, সে তোমাকেই পেয়েছে স্বামী হিসেবে।

নারায়ণ ঋষির কথা উপেক্ষা করার সাধ্য ছিল না নারদের। বাধ্য হয়েই একদিন ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে মহা ধুমধামে তাকে বিয়ে করতে হল।

বিয়ের পর কিছুকাল কেটেছে।

হঠাৎ দেখা ব্রহ্মার আর এক বিবাগী ছেলে সনৎকুমারের সঙ্গে।

সনৎকুমার বলল—নারদ এ কি করছ? বিয়ে করে কি কৃষ্ণনাম ভুলে গেলে? এখনও সময় আছে। যদি বাঁচতে চাও তো কৃষ্ণনাম নিয়ে সংসার থেকে পালাও।

চৈতন্য এল নারদের, সত্যিই তো। সংসার করার জন্য তো তিনি আসেন নি। এ কি দুর্বিপাক!

তারপর হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সব মায়ামোহ কাটিয়ে কৃষ্ণনামে এমন মজে গেলেন নারদ যে, তার আর তুলনা নেই।

তিনতারের বীণা হাতে নারদ চলে গেলেন নাম-গান গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে। হয়ে গেলেন ভগবান বিষ্ণুর একান্ত আপনজন।

বেদবতীর কাহিনী

শিবভক্ত রাজা হংসধ্বজের দুই ছেলে ধর্মধ্বজ আর কুশধ্বজ। সূর্যদেবের অযথা অভিশাপে শ্রীহীন হয়ে মারা গেলেন হংসধ্বজ।

বাবার মৃত্যুর পর দু-ভাই ধর্মধ্বজ আর কুশধ্বজ হলেন রাজা। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলে কি হবে, দু-জনেই ছিলেন মহা তাপস। আর রানীরাও ছিলেন সেই রকম।

সূর্যদেবের অভিশাপে কিছুই তাঁদের থাকার কথা নয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করে, তাঁরা আবার সব ফিরে পেয়েছিলেন। কুশধ্বজের স্ত্রী মালাবতী ছিলেন দারুণ পতিব্রতা।

যথাসময়ে কুশধ্বজের একটি মেয়ে হল। ফুটফুটে মেয়ে। একবার দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেয়, সাধ্য কার। যেন স্বয়ং লক্ষ্মী। আদর করে সবাই তার নাম রাখলেন বেদবতী।

জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু তার কাণ্ড দেখে সকলে অবাক হয়ে গেল। চারদিকের আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা, কারোর দিকে না তাকিয়ে বেদবতী হঠাৎ উঠে গুট...গুট করে চলতে শুরু করে দিল। শুধু চলা নয়, সবাই দেখল, বাড়ি থেকে সটান বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

হাঁ...হাঁ... করে উঠলেন সবাই। ছুটে এলেন তাকে ধরতে।

সকলেই অবাক হয়ে শুনলেন, অতটুকু শিশু বেদবতীর মুখে স্পষ্ট কথা— আমাকে আটকে রেখো না, ছেড়ে দাও।

—কোথায় যাবে তুমি? এতক্ষণে রাজা-রানী এবং আর সবাই বুঝে

নিয়েছেন, এ কোন সাধারণ মেয়ে নয়।

—আমি তপস্যায় যাব।

—এখনই কেন মা? একটু বড় হও, বয়স হোক। তখন না হয় যেয়ো। তবুও বাধা দেবার চেষ্টা করলেন সকলে।

কিন্তু কোন অনুরোধ-উপরোধেই টলল না বেদবতীর মন।

বেদবতী সোজা চলে গেল পুষ্করতীর্থে। সেখানে বসল তপস্যায়।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। তপস্যায় অটল বেদবতী।

শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে এখন। কিন্তু না নিয়মিত আহার, না শরীরের প্রতি কোন যত্ন। অমন যে সোনার মত গায়ের রং, তা মলিন হয়ে গেল। স্বাস্থ্যও গেল। সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তার।

একদিন হঠাৎ সে শুনল আকাশবাণী। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন—মেয়ে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে কিসের জন্য তুমি এমন কঠোর তপস্যা করছ? কি তোমার অভিলাষ?

বেদবতী বললেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীহরিকে আমার স্বামীরূপে পাওয়ার বাসনাতেই আমার এই তপস্যা।

আকাশবাণী বলল—বেদবতী, এ জন্মে নয়। পরজন্মে তোমার এই অভিলাষ পূর্ণ হবে।

শুনে মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হল বেদবতী। কেন পরজন্মে? এ জন্মে নয় কেন?

পুষ্কর থেকে উঠে এবার বেদবতী সোজা চলে গেল গন্ধমাদন পর্বতে। আরো কঠোর তপস্যা করবে সে, যাতে এ জন্মেই তার আশা মেটে।

গন্ধমাদনে নিরালা জায়গা দেখে, নিজের মনের মত তৈরি করে নিল একটা আশ্রম। বেদবতী বসল সুকঠোর তপস্যায়। ভগবান নারায়ণ ছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই তার মনে।

কেটে গেল এভাবে আরো কয়েক বছর।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে একদিন রাক্ষসরাজ রাবণ অতিথির বেশে হাজির সেখানে।

আশ্রমবাসী তপস্বিনী বেদবতী। তার মনে নেই কোন সঙ্কোচ, ভয় বা আশঙ্কা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাকে আহ্বান জানিয়ে বসার আসন দিল বেদবতী। পা-ধোওয়ার জল দিল। যে-ই হোক,অতিথি। অতিথি যে নারায়ণ। তার সেবা সবার আগে।

হাত-পা ধুয়ে রাবণ বসল আসনে। চকিতে বেদবতী ফল-মূল এনে দিল অতিথির আহারের জন্য। রাবণ মুখ বুজে সবই খেল। অতিথিসেবায় দারুণ খুশি রাবণ আশ্রমে বসে বিশ্রাম করল।

স্বভাবে রাক্ষস। পাপ মন তার যাবে কোথায়? চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বেদবতীকে। আর ভাবে, কতই-বা বয়স? এই বয়সে তপস্বিনী!

নিজেকে আর চেপে রাখতে না পেরে বলেই বসল রাবণ—দেখ, এই বয়সে তোমাকে এরকম তপস্বিনীর বেশে মানায় না। এখন কি এভাবে তপস্যা করার সময় তোমার? না,এমন নির্জন স্থানে একা একা থাকা শোভা পায়?

অতিথির কথা শুনে চমকে ওঠে বেদবতী। রাবণের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই।

—তাছাড়া তুমি এখানে বসে কার তপস্যা করছ? বলল রাবণ—আমি ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ। সব দেবতারা চলে আমার আদেশে। তোমার উচিত, আমারই তপস্যা করা। চল, আমার সঙ্গে আমার প্রাসাদে। হাজার

হাজার দাসী আমার, তোমার পদসেবা করবে। কেন এখানে এভাবে জীবন নষ্ট করছ?

বেদবতী শুনে আরও অবাক হল। এমন কথা যে কখনও শুনতে হবে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। আর বুঝতেও পারেনি, অতিথির ছদ্মবেশে এসেছে পাপচারী অসুর রাবণ।

ভগবান নারায়ণ ছাড়া সে তো আর কাউকে জানে না। শৈশব থেকে সে যে তাঁরই ধ্যানে মগ্ন, তাঁকে পাবার আশাতেই যে তাঁর এত সাধনা। এ কি পাপ তাকে শোনাতে এল রাবণ?

বেদবতী যখন এমন ভাবে তন্ময়, রাবণ্য আর ধৈর্য রাখতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে বেদবতীর হাত ধরে টান দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বেদবতীও রুখে দাঁড়াল। এক ঝটকায় নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত করে এমন কটমট করে তাকাল রাবণের দিকে যেন ঝলকে ঝলকে ছুটে আসতে লাগল আগুন।

সরোষে গর্জন করে উঠল সে—অতিথি-জ্ঞানে তোমার সেবা করলাম। তার বিনিময়ে এই প্রতিদান? জীবনে আমি কখনো কুচিন্তা করিনি। ভগবান নারায়ণ ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না। অবলা পেয়ে তুমি এলে অত্যাচার করতে? শোন রাবণ, আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, সবংশে তোমাকে ধ্বংশ হতে হবে। তোমার ঐ পাপ হাত দিয়ে তুমি আমাকে ছুঁয়েছ। অপবিত্র-আমার এই শরীর আমি রাখব না।

বেদবতীর সেই চোখ, আর গম্ভীর গলায় কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল রাবণ। কিন্তু যদিও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সে, তবু কিছুই আর করার সুযোগ পেল না। যোগবলে বেদবতী ইতিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করে বসে আছে।

মনের বাসনা পূর্ণ হল না দেখে রাবণ রেগে বেদবতীর মৃত শরীরটা টেনে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে চলে গেল।

আকাশবাণী কিন্তু মিথ্যা হয়নি। মিথ্যা হয়নি বেদবতীর অভিশাপও।

পরজন্মে এই বেদবতীই জনককন্যা সীতারূপে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রকে লাভ করেছিল। আর রাবণ এই সীতাকে হরণ করেই রামচন্দ্রের হাতে সবংশে নিধন হয়েছিল।

তুলসী ও শঙ্খচূড়ের ইতিকথা

গন্ধমাদনে মনোরম প্রাসাদে রাজা ধর্মধ্বজ মহাসুখে থাকতেন রানী মাধবীকে নিয়ে।

মনোমত পত্নীকে নিয়ে রাজর্ষি ধর্মধ্বজ এভাবে দিন কাটাতে কাটাতে একদিন রানী হলেন সন্তান-সম্ভবা।

বহুদিন পরে দেখবেন সন্তানের মুখ, রাজা-রানীর সে কি আনন্দ!

সময় পেরিয়ে গেল, সন্তান আর ভূমিষ্ঠ হয় না। দেখে বেশ চিন্তায় পড়লেন রাজা। কোন বিপর্যয় ঘটল না তো? ভালভাবে দেখেন ধর্মধ্বজ রানীকে। সেরকম কিছুই কিন্তু দেখতে পেলেন না। পেটে সন্তানের ভার, অথচ মাধবীর তার জন্য কোন কষ্টই নেই। বেশ হাসি-খুশিতেই আছেন।

দিব্য পরিমাণে যখন একশ বছর কেটে গেল, তখন এক শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে মাতৃজঠর থেকে বের হয়ে এল সন্তান—একটি কন্যারত্ন। কি অপূর্ব সে মেয়ের মুখ! দেখে প্রাণ জুড়িয়ে যায় রাজা-রাণীর। পুরবাসীরা অনেক ভেবে-চিন্তে তার নাম রাখল তুলসী।

জাতিস্মর তুলসী জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল তার পূর্বজন্মের কথা। সে ছিল গোলোকে, আর সব গোপরমণীদের মত কৃষ্ণের সেবিকা হয়ে। যদিও রাধা ছিলেন গোপী-প্রধান, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বেশ

সমীহও করে চলতেন, তবুও সকলকেই তিনি সমান ভালবাসতেন। তুলসীও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাউকে জানত না।

হঠাৎ একদিন রাসমণ্ডলে তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করতে দেখে রাধা উঠলেন দারুণ রেগে। তাঁর ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁরই স্বামী। আর কোন গোপনারী নয়। তাই নিরালায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলসীকে দেখে তাঁর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। অভিশাপ দিয়ে বসলেন, পাপাচারী তুই। তোর স্থান গোলাকে নয়। যা মর্ত্যে, গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মা গে।

রাধাকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ ভয় করতেন, গোপীরাও তেমনি। তাই তাঁর মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস পেত না।

অভিশাপ পেয়ে তুলসীর মন গেল ভেঙে। মনে মনে তার স্বামীই যে শ্রীকৃষ্ণ—তাঁকে ছেড়ে মর্ত্যে কি করে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণও কিন্তু মন-প্রাণ দিয়ে তুলসীকে ভালবাসতেন। কিন্তু ঐ রাধার ওপর কোন কথাই তিনি বলতে পারতেন না। তাঁর মনে ব্যাথা লাগল।

ছলছল চোখে তুলসী তাঁর দিকে তাকালে তিনি বললেন—এখানে যে আমার কিছু করার নেই তুলসী। রাধার অভিশাপ তোমায় ভোগ করতে হবে। তুমি মর্ত্যে গিয়ে নারায়ণের তপস্যা কোরো। আমাতে আর নারায়ণে কোন ভেদ নেই, তুলসী। ওটা আমারই আর এক রূপ। ব্রহ্মার বরে নিশ্চয়ই তুমি শাপমুক্ত হবে। তোমাকে ছেড়ে থাকা কি আমারও কিছু কম কষ্টের?

সেই অভিশাপেই এ জন্মে সে রাজর্ষি ধর্মধ্বজের মেয়ে হয়ে জন্মেছে। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সকলকে ছেড়ে বেদবতীর মতই সে চলে গেল বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মার তপস্যায়।

সে কি তপস্যা! বেশ কয়েক বছর কাটল কেবলমাত্র ফলমূল খেয়ে। আরো বেশ কয়েক বছর কাটাল শুধু মাত্র জল খেয়ে। তারপর কেবলমাত্র বায়ু। একটা মেয়েকে এমন তপস্যা করতে আগে কেউ দেখি নি। একমাত্র ইন্দ্রপদ পাবার জন্যই অসুররা এ রকম তপস্যা করত। কিন্তু তুলসী? ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, যমলোক—ওসব কিছুই তার চাই না। তুলসীর শুধু

একটাই কামনা—যেমনটি ছিল সে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণের আপনজন হয়ে, এজন্মেও সে হতে চায় তেমনি নারায়ণের আপনজন।

এমনভাবে সুদীর্ঘকাল যখন তপস্যায় কেটে চলেছে তুলসীর দিন, ব্রহ্মা আর স্থির থাকতে না পেরে একদিন এলেন তার কাছে। বললেন—তোমার এই কঠোর তপস্যা থামাও তুলসী। বল, কি তোমার অভিলাষ? কি চাই?

ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে তুলসী বলল—ভগবান, আপনার তো কিছু অজানা নেই। রাধার শাপে আমার এই পরিণতি। এ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। ফিরে যেতে চাই গোলোকে নারায়ণের সেবিকা হয়ে। আর রাধার ভয় যেন দূর হয় আমার মন থেকে।

ব্রহ্মা বললেন—তোমার অভিলাষ এ জন্মে তো আমি পুরণ করতে পারব না। পরজন্মে অবশ্যই তুমি নারায়ণকে স্বামী হিসেবে পাবে। এ জন্মে যে তোমাকে অসুররাজ শঙ্খচূড়ের পত্নী হয়ে থাকতে হবে, তুলসী। আমি যে আগেভাগেই তাকে সে বর দিয়ে বসে আছি।

শুনে অবাক হয় তুলসী। জিজ্ঞেস করে—শঙ্খচূড়...অসুর! কে সে? তাকে তো আমি চাই নি।

ব্রহ্মা বললেন—সময় এলেই তার পরিচয় পাবে। তবে তাতে তোমার কোন অমঙ্গল হবে না। তারপর নারায়ণকে অবশ্যই তুমি পাবে।

—কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ।

—দৈব-দুর্বিপাকে তোমার ওপর আসবে এক অভিশাপ। যার ফলে তুমি গাছ হয়ে থাকবে পৃথিবীতে। আর তোমার পাতা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের

সেবাই হবে না। এ ছাড়াও আমার বরে তোমার মন থেকে রাধার ভয় নিশ্চয়ই দূর হয়ে যাবে। বলে চলে গেলেন ব্রহ্মা।

এ জন্মে নারায়ণকে পাবে না জেনেও তুলসী কিন্তু নারায়ণের পায়েই মন-প্রাণ দিয়ে রইল। শঙ্খচূড় অসুরের কথা যেন ভুলেই গেল। তপস্বিনী বেশে মনের আনন্দে আপন মনে শ্রীকৃষ্ণ আর নারায়ণের সঙ্গেই খেলা করে দিনরাত কাটাতে লাগল।

এমনভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর।

ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপের স্ত্রী দনুর বংশে জন্ম অসুররাজ শঙ্খচূড়ের। দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, দানব,—সব তার শাসনাধীনে।

দেববরে বলীয়ান সে। কঠোর তপস্যায় সে বিষ্ণুর কাছ থেকে আদায় করেছিল রক্ষাকবচ। যতক্ষণ সেটি থাকবে তার গায়ে, ততক্ষণ কোন অস্ত্রই তাকে আঘাত হানতে পারবে না। ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছিলেন—মনের মত স্ত্রী-রত্ন শঙ্খচূড় অবশ্যই পাবে। স্ত্রীও পতিব্রতা হবে। কিন্তু যেদিন স্ত্রীর মর্যাদা সে রাখতে পারবে না, সেদিন কিন্তু শঙ্খচূড়কে মরতে হবে।

বর পেয়ে শঙ্খচূড়কে আর পায় কে?

দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের জন্মবধি শত্রুতা। তাই শঙ্খচূড় আগেই দেবরাজ্য আক্রমণ করে দিল দেবতাদের তাড়িয়ে, কেড়ে নিল অধিকার। হয়ে বসল ত্রিভুবনের রাজা।

একদিন এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শঙ্খচূড় এসে হাজির হল বদরিকাশ্রমে। সেখানে তুলসীকে দেখেই মনে পড়ে গেল তাঁর পূর্বজন্মের কথা। অমন যে বীর, তুলসীকে দেখেই তার মন হয়ে উঠল দারুন চঞ্চল।

তুলসীও দেখল তাকে। কিন্তু তার মনে কোন আশঙ্কা জাগল না। অসুর বংশে জন্ম হলে কি হবে, দেখতে তো কদাকার ছিল না শঙ্খচূড়কে। বেশ সুদর্শন আর সুপুরুষ চেহারা।

নির্ভয়ে শঙ্খচূড় তুলসীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সরাসরি বলে বসল- তুলসী, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। তুমি অমত কোরো না। আমি অসুররাজ শঙ্খচূড়।

তুলসী কিন্তু বাধা দেয়। বলে—না, তা হতে পারে না। আমি আমার স্বামী হিসেবে একমাত্র নারায়ণকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। তুমি ঐ প্রস্তাব আমার কাছে আর কখনও রেখো না, যাও।

শঙ্খচূড় বলল—তুলসী, তুমি জাতিস্মর। আমিও আমার পূর্বজন্মের কথা ভুলি নি। অসুরজন্মে আমি ব্রহ্মার কাছে তোমাকেই স্ত্রী হিসেবে পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনিও আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। আজ তোমার দেখা পেলাম।

দু-জনের মধ্যে যখন এমনি কথাবার্তা চলছিল ঠিক সেই সময়েই ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন সেখানে।

বললেন—শঙ্খচূড় ঠিক কথাই বলেছে। ও তোমাকেই স্ত্রীরূপে পেতে চেয়েছিল আমার কাছে। আর আমিও তা মঞ্জুর করেছি।

ব্রহ্মার আদেশ। তুলসী আর এড়াতে পারল না। চোখ বুজে একবার দেখে নিল তার পূর্বজন্মের দিনগুলো। শঙ্খচূড়ের চোখের সামনে ভেসে উঠল বৈকুণ্ঠের দিনগুলো। অপলক দৃষ্টিতে সে তখন শুধু তাকিয়ে থাকত তুলসীর দিকে। মনে মনে গুমরে মরত। কাছে যেতে পারত না রাধার ভয়ে। আর আজ!

বিয়ে হয়ে গেল তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের।

শঙ্খচূড়ও মনের আনন্দে তুলসীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল পৃথিবীর যেখানে যত রমণীয় স্থান আছে, সেখানে। তার প্রাণ-ঢালা ভালবাসায় তুলসীও প্রায় ভুলে গেল সব কিছু।

দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মন্বন্তর। না হয় শঙ্খচূড়ের পতন, না দেবতারা ফিরে পান তাঁদের স্বর্গরাজ্য।

আর স্থির থাকতে না পেরে দেবতারা গিয়ে ধরলেন ব্রহ্মাকে—পিতামহ, আর কতদিন আমাদের ভিখিরি হয়ে থাকতে হবে? আপনি কি আমাদের কথা একটুও ভাববেন না?

ব্রহ্মা বললেন—দেখ, আমি একা নিরুপায়। শঙ্খচূড় আমারই বরে বলীয়ান। কি করি বল তো? অথচ তোমাদের কষ্টও আমি দেখতে পাচ্ছি। চল, বরং শঙ্করের কাছে যাই। ও যদি কোন উপায় বের করতে পারে।

সবাই মিলে এলেন তখন কৈলাসে শিবের কাছে। শিব শুনে বললেন—দেখ, আমার মাথায় কিছু আসছে না। চল, বরং আমরা যাই শ্রীহরির কাছে। উনি যদি কোন উপায় বাতলে দিতে পারেন।

দেবতাদের নিয়ে ব্রহ্মা আর শিব হাজির হলেন বৈকুণ্ঠে।

সুখাসনে বসে ভগবান শ্রীহরি। দেব-দেবতারা আসতেই সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—কি ব্যাপার? সকলে যে আজ হঠাৎ এখানে!

ব্রহ্মা বললেন—না এসে আর উপায় কি বলুন। এখন আপনি রাখলে সব থাকবে, আর মারলে সব যাবে।

—এমন কথা কেন বলছ ব্রহ্মা? পৃথিবীতে এমন কি হল, যা তোমাদের শাসনের বাইরে? সব জেনেও মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন ভগবান।

—আজ্ঞে, এক মন্বন্তর তো হল। দেবতারা বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন। অসুর শঙ্খচূড় যে সৃষ্টিটা গ্রাস করে ফেলল, ভগবান। এখন আপনি যদি দয়া না করেন, দেবরাজ্য যে আর থাকে না। বললেন ব্রহ্মা।

—শঙ্খচূড়! একটু যেন বিস্ময়ের ভান করলেন শ্রীহরি। তারপর বললেন—ঐঃ, হ্যাঁ...হ্যাঁ মনে পড়ছে। তা মন্বন্তর হয়ে গেল নাকি? তাহলে তো ওকে এবার ফিরিয়ে আনতেই হয়।

—সে জন্যই তো আমরা আপনার কাছে এসেছি ভগবান। বললেন দেবতারা।

—দেখ দেবগণ, শিব ছাড়া ও কারো হাতেই বধ্য নয়। আর আমার এই ত্রিশূল ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রেই ও মরবে না। এই বলে শ্রীহরি শঙ্খচূড়ের প্রাণঘাতী ত্রিশূলটি তুলে দিলেন শিবের হাতে। আরও একটা কথা, সেটা হল ওর কবচ। ওটা আমিই দিয়েছিলুম। যতক্ষণ ওটা থাকবে ওর গায়ে, ততক্ষণ কোন অস্ত্রই ওকে কাবু করতে পারবে না।

তাহলে?

মৃদু হেসে শ্রীহরি বললেন—ঠিক আছে, ওটার ভার আমার হাতেই থাক। এ ছাড়াও একটা রহস্য আছে। সেটাও না হয়, আমিই দেখব।

নিশ্চিন্ত হলেন স্বর্গভ্রষ্ট দুঃখী দেবতারা। স্বয়ং ভগবান যখন ভার নিয়েছেন, তখন আর চিন্তা কি? নিশ্চিন্তে আয়োজন করা যেতে পারে।

ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে চলে আসবেন দেবতারা, এমন সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রীহরি বললেন—আমার জন্যই বেচারাকে এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে, জান? গোলোকে ও ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় সখা। বলতে পার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ওর নাম ছিল সুদামা। আমার সব কাজে, সব সময় ও আমার সঙ্গে থাকত ছায়ার মত। একদিন রাধার চোখ এড়িয়ে রাসমণ্ডলে গিয়েছিলাম সখী বিরজার ঘরে। সুদামা বাইরে ছিল পাহারায়। হঠাৎ খুঁজতে খুঁজতে রাধা সেখানে এসে হাজির। বিরজা তো রাধার ভয়ে লজ্জায় জলের আকার নিয়ে নদী হয়ে গেল। আমি পালিয়ে এসেছিলাম আমার ঘরে। রাগে রাধা আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসে যথেচ্ছ অপমান করল আমায়। রাধার সব অপমান আমি গায়ে মেখে নিলাম হাসিমুখে। কিন্তু বন্ধু সুদামা সহ্য করতে পারল না। সে রাধার মুখের ওপর যা হোক দুটো কথা বলে বসল। আর যায় কোথা? রাধাও তাকে অভিশাপ দিয়ে বসল, 'তুই অসুরকুলে অসুর হয়ে জন্মাগে।' রাধার অভিশাপে সুদামা কেঁদে আকুল। মাথা ঠাণ্ডা হলে অবশ্য রাধা বলেছিল, 'ঠিক সময়ে আবার তুমি বৈকুণ্ঠেই ফিরে আসবে।' বলে একটু থেমে শ্রীহরি বললেন—তাই বলছিলাম, ওর জন্য আমারও কষ্ট কিছু কম নয়।

শ্রীহরির কাছ থেকে শূল নিয়ে শ্রীহরির আদেশে শিব এসে ছাউনি ফেললেন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে। দূত করে প্রথমে পাঠালেন তাঁরই এক অনুচর পুষ্পদন্তকে।

দৈত্যপুরের বিশাল প্রাসাদে সুবিশাল জাঁকজমকের মধ্যে তখনো মনের আনন্দে শঙ্খচূড় দিন কাটাচ্ছিল তুলসীর সঙ্গে। জানতও না, ইতিমধ্যে দেবগণ প্রস্তুত; আবার যুদ্ধে যেতে হবে তাকে।

পুষ্পদন্ত এসে শিবের আদেশ শোনাল শঙ্খচূড়কে।

দেবতাদের রাজ্য হয় সে ফিরিয়ে দিক, নয়তো শিব বাধ্য হবেন তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

দূতের কথা শুনে শঙ্খচূড় বলল—তোমার মনিবকে গিয়ে বল, এর

জবাব দিতে আমি নিজেই যাব চন্দ্রভাগার তীরে।

খবর পেয়ে শিবের কাছে এসে একে একে এসে জড়ো হলেন কার্তিক, গণেশ, বীরভদ্র থেকে তাঁর বাকি গণেরা, কালী, এমন কি শত হাত নিয়ে ভদ্রকালী পর্যন্ত। সঙ্গে নানা অস্ত্রশস্ত্র।

গম গম করে উঠল চন্দ্রভাগার তীর।

শঙ্খচূড়ও প্রস্তুত। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সে তখন অনুভব করতে শুরু করেছে মুক্তির আনন্দ। এতদিনে তাহলে তাকে মনে পড়েছে সখা কৃষ্ণের। কিন্তু বাইরের ভাব দেখলে কে তা বুঝবে।

দৈত্যপুরে বেজে উঠল যুদ্ধের ডঙ্কা। রণসাজে সেজে চলল দানবরা। বহুদিন পর আবার হবে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ। কি উল্লাস তাদের!

তুলসীর সঙ্গে দেখা করে, তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শঙ্খচূড়ও বের হল দৈত্যপুর থেকে। যাবার আগে শুধু ইঙ্গিতে তুলসীকে বলে গেল—আমাদের পূর্বজন্মের কথা আমরা কেউ ভুলি নি তুলসী।

সবার আগে শঙ্খচূড়ের রথ। নানা অস্ত্রে সজ্জিত সে। পিছনে অগণিত দানবসেনা।

চন্দ্রভাগার তীরে পৌঁছে শিবকে দেখেই শঙ্খচূড় প্রথমে তাঁকে প্রণাম জানাল। তারপর বলল—এভাবে যে আপনার দেখা পাব, তা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। আমরা অসুর, যুদ্ধ করি দেবতাদের সঙ্গে। করে আসছি, আসবও। কিন্তু এর মধ্যে আপনি কেন দেবাদিদেব?

শিব বললেন—বাধ্য হয়েই আসতে হল আমাকে। আচ্ছা শঙ্খচূড়, তুমি তো মূর্খ নও। যথেষ্ট জ্ঞানী। তাছাড়া আমি জানি, পূর্বজন্মে তুমি ছিলে কৃষ্ণের সখা, পরম বৈষ্ণব। যে কোন কারণেই হোক, অসুর হয়ে জন্মেছ বলে, তোমার আচার-আচরণ সবই কি অসুরের মত হবে। এ তো আমি ভাবতেই পারি না।

—আমার অন্যায় আচার-আচরণ কি দেখলেন, দেবাদিদেব?

—কোন অপরাধে তুমি তোমার ভাই দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে তাঁদের অধিকার কেড়ে নিলে? এই জ্ঞাতিবিরোধ কি তোমার করা উচিত হয়েছে?

—যদি ও কথাই বলেন, দেবাদিদেব, কি অপরাধ করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ হিরণ্যকশিপু, বলি, যে আপনারা কৌশলে তাকে বধ করলেন? শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করালেন দুর্গাকে দিয়ে? জ্ঞাতি-ভাই হয়েও দেবতারা কি সত্যিই কোন দিন কোন উদারতা দেখিয়েছেন আমাদের ওপর? বলেই শঙ্খচূড় বলল—ও কথা থাক। আমি শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, আপনি স্বয়ং এসেছেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অবশ্য নিঃসন্দেহে এটা আমার সৌভাগ্য যে, আজ এই যুদ্ধে শিব নিজে আমার হাতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

শুনে শিব বললেন—একান্তই যদি তাই হয়, তাহলেও আমার কিছু লজ্জা নেই শঙ্খচূড়। প্রকৃত একজন ভক্ত বীরের কাছে পরাজয়ে কি কোন ক্ষোভ থাকে?

কথা যা ছিল শেষ হয়ে গেছে। আবেদনে কোন ফলই হল না। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন গতি নেই।

একদিকে শিবপুত্র কার্তিক থেকে শিবানুচররা একদিকে, আর একদিকে শঙ্খচূড় নিজে আর তার দানবসেনারা।

ধনুকের টঙ্কারে, উল্লাসে চন্দ্রভাগার তীর তখন রীতিমত এক যুদ্ধক্ষেত্র।

শঙ্খচূড়ের ধনুক থেকে বাণের পর বাণ ছুটে আসে আগুনের হল্কার মত। আছড়ে পড়ে কার্তিকের গায়ে। মহাবীর কার্তিক। প্রতিরোধের হাজার চেষ্টা করেও সবাই যখন প্রায় বিফল হয়ে পড়ছেন, তখন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন নানা অস্ত্র নিয়ে কালী নিজে।

শিবের বীরগণ আর কালী মিলে প্রায় শেষ করে ফেললেন অসুর-সেনা। কিন্তু শঙ্খচূড় তখনো অটল। যে অস্ত্রই নিক্ষেপ করেন কালী অসুরকে লক্ষ্য করে, শঙ্খচূড় নিজের অস্ত্র দিয়ে তা শুধু প্রতিরোধই করে চলে। নারায়ণী অস্ত্র পর্যন্ত কালীর যখন বিফল হয়ে গেল, তখন শঙ্খচূড়কে বধ করার জন্য তিনি তুলে নিলেন পাশুপত। কিন্তু ছুঁড়তে আর পারলেন না। ছুঁড়তে যাবেন কি, শুনলেন দৈব্যবাণী, 'কালী থামো।পাশুপত বৃথা যাবে। শঙ্খচূড় তোমার হাতে বধ্য নয়।' একটু থেমে আবার কালী তুললেন পাশুপত। আবার সেই দৈববাণী। বাধ্য হয়ে কালী তখন অস্ত্র

ছেড়ে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শঙ্খচূড়ের ওপর। শঙ্খচূড়ের রথ গেল, ধ্বজা গেল, কালীর প্রচণ্ড প্রহারে সে হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরতে আবার উঠল। কিন্তু কালীর বিরুদ্ধে কোন অস্ত্রই সে প্রয়োগ করল না। বারবার শুধু তাঁকে নমস্কারই করে গেল।

নিরুপায় হয়ে কালী শিবের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন সব কিছু—আশ্চর্য! সে শুধু আমার অস্ত্র প্রতিরোধ করল, মারল না আমাকে এক ঘা-ও। বদলে মাকে যেমন ছেলে প্রণাম করে, আমার মার খেয়েও তেমনি ভাবে বারবার প্রণামই করে গেল। পাশুপত তুললাম। তাও দৈববাণী, আমার হাতে নাকি সে বধ্য নয়।

শুনে মৃদু হাসলেন শিব। বললেন—ঠিকই তাই, কালী। অসীম শক্তিধর শঙ্খচূড় তোমার বধ্য নয়। ঠিক আছে। আজ আমিই যুদ্ধে যাব—এই ত্রিশূল হাতে। দেখব, কত বড় বীর সে।

পরদিন আবার শুরু হল যুদ্ধ। এবার দেবসেনাদের নিয়ে শিব এলেন নিজে।

শিবকে দেখেই রথ থেকে নেমে শঙ্খচূড় আগে তাঁকে প্রণাম করে নিয়ে শুধু বলল—কোন অপরাধ নেবেন না দেবাদিদেব।

তারপরই রথে উঠে হাতে ধনুক তুলে নিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল রণহুঙ্কার।

গর্জন করে উঠলেন শিবের সঙ্গে শিব-সেনারাও।

শুরু হল সংগ্রাম। প্রায় সমানে সমানে। কে হারে, কে জেতে! দিন নেই, রাত নেই—চলেছে তুমুল সংগ্রাম।

দেবসেনাদের হাতে

প্রায় একে একে মারা গেল অসুরসেনারা। বাকি আছে আর সামান্যই। কিন্তু শঙ্খচূড় যে একাই অনেক। তাদের হাতে যে সব দেবসেনা মারা পড়ল, শিব তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তুললেন।

দেখে দারুণ আক্রোশে শঙ্খচূড় আবার শত শত শরের জাল বিস্তার করে মারতে উদ্যত হল দেবসেনাদের।

শিবও আর ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে হাতে তুলে নিলেন শ্রীহরির দেয়া শঙ্খচূড়ের প্রাণঘাতী সেই ত্রিশূল। কিন্তু শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাবেন কি, শুনলেন আকাশবাণী?—'অপেক্ষা কর শিব। এখনই তুমি ওকে বধ করতে পারবে না। আমার দেয়া রক্ষাকবচ আছে ওর শরীরে। তা ছাড়াও আছে ব্রহ্মার বর। একটু সময় কাটাও। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে তোমায় যখন জানাব, তখন শঙ্খচূড়কে বধ কোরো তুমি।"

বাধ্য হয়েই কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘটাতে হল শিবকে।

একদিকে শিবের সঙ্গে দেবসেনা, আর একদিকে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে সামান্য অসুর সেনা।

এমন সময় হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন শঙ্খচূড়ের কাছে। বললেন—শুনেছি, আপনি একজন দানবীর। জীবন থাকতে কোন প্রার্থীর প্রার্থনা আপনি অপূর্ণ রাখেন নি। আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বড় অসহায় হয়ে আপনার কাছে এক প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, যদিও আপনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে।

—তা হোক। বলুন, আপনার কি প্রার্থনা। নিশ্চয়ই আমি তা পূরণ করব। বলল শঙ্খচূড়।

—আগে কথা দিন, যা চাইব তাই দেবেন। ফেরাবেন না। জানি, আপনি কখনো কথার খেলাপ করেন না। বললেন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ নারায়ণ।

—কথা দিলাম।

—আপনার গায়ে যে সোনার কবচটা আছে, ওটা আমায় দিন। প্রার্থনা জানালেন ব্রাহ্মণ।

—এই মাত্র? বলেই ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, এই ভাবে নিজের গা থেকে খুলে দিলেন ব্রাহ্মণকে সেই রক্ষাকবচ। একটুও দুঃখ পেল না তাতে

শঙ্খচূড়, বরং মনে মনে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কবচ নিয়েই ব্রাহ্মণ গেলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা দৈত্যপুরীতে। এরপর আছে আর একটু ছোট কাজ। সেটুকু শেষ করতে পারলেই শঙ্খচূড়ের মুক্তি।

কতদিন হল যুদ্ধে গেছে শঙ্খচূড়। কোন খবরই পাচ্ছে না তুলসী। মনটা দিন রাত তার ছটফট করছে।

হঠাৎ প্রাসাদে সেনাদের উল্লাসধ্বনি শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দেখে, ফিরে এসেছে তার স্বামী শঙ্খচূড়।

উদ্‌গ্রীব তুলসী সাদরে স্বামীকে সম্ভাষণ জানিয়ে অন্তঃপুরে নিয়ে বসাল। সেবা পরিচর্যা করল। তারপর জানতে চাইল, যুদ্ধের কি হল।

হাসতে হাসতে শঙ্খচূড় বলল—দেবাদিদেব অনেক করে অনুরোধ করলেন, তাই মিটমাট করে এলাম। দেবতাদের রাজ্য দেবতাদের ফিরিয়ে দিয়ে এলাম। আর ভাল লাগছে না তুলসী। যুদ্ধেটুদ্ধে গেলেই তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে—এ আমার মন সায় দেয় না।

শুনে খুবই খুশি তুলসী।

দিন গেল, রাত এল।

স্বামী যাতে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারে তার আয়োজন করে তুলসী তার সেবা করতে বসল।

সতী-সাধ্বী তুলসী। তার চোখকে কি সহজে ফাঁকি দেয়া যায়?

কিছুটা রাত হতেই ধরা পড়ে গেলেন শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে নারায়ণ।

ইতিমধ্যে আকাশবাণী চলে গিয়েছিল শিবের কাছে—সব কাজ শেষ হয়েছে। এবার তুমি শূল দিয়ে নিশ্চিন্তে শঙ্খচূড়কে বধ কর।

শোনামাত্র শিবও আর কালক্ষেপ না করে শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে যেই শূল ছুঁড়লেন, অমনি তা তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আবার ফিরে এল শিবের হাতে। থেকেও গেল তাঁরই কাছে। তাই শিবের আর এক নামই হয়ে গেল 'শূলপাণি।'

মনে প্রথমে খুবই ব্যথা পেল তুলসী। ছলনা করে তার স্বামী শঙ্খচূড়কে এইভাবে নিধন করা! কি নিষ্ঠুর হৃদয় নারায়ণের! যদিও

আশৈশব তুলসী এই নারায়ণকেই স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করে এসেছিল, তবুও এই মুহূর্তে শঙ্খচূড়ের মৃত্যুতে এতই কাতর হয়ে পড়ল তুলসী যে নারায়ণকে লক্ষ্য করে বলে বসল—এতই যখন পাষাণ-হৃদয় তোমার, তুমি পাথর হয়ে থাক।

নারায়ণ বললেন—তাই থাকব তুলসী। গণ্ডকীর ধারে আমি নানা আকারের, নানা রূপের শিলা হয়ে থাকব। পৃথিবীতে তা হবে আমারই প্রতিনিধি শালগ্রাম শিলা। আর তুমিও এবার তোমার তপস্যায় ফল লাভ করে নির্ভয়ে থাকবে আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে। পৃথিবীতে থাকবে তোমার স্মৃতি। তোমার দেহ হবে গণ্ডকী নদী। তোমার কেশ হবে তুলসীবৃক্ষ। যে কোন শুভ কাজই হোক পৃথিবীতে, তোমাকে বাদ দিয়ে হবে না। আর তোমার নামের যে গাছ জন্মাবে, তার পাতা ছাড়া আমারও যদি কেউ পূজা করে, সে পূজা বিফল হবে।

মনের ক্ষোভ দূর হল তুলসীর। যেটুকু অশান্তি ছিল নারায়ণের মনে, তাও দূর হয়ে গেল।

কৃষ্ণ-সখা সুদামা আবার ফিরে গেল বৈকুণ্ঠে। নারায়ণের ইচ্ছায় তারও স্মৃতি রয়ে গেল পৃথিবীতে শাঁখের মধ্যে। নারায়ণও ফিরে পেলেন হরিপ্রিয়া তুলসীকে।

রাধাকে আর তাঁদের কারো ভয় নেই।

সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী

মদ্ররাজ অশ্বপতি, রানী মালতী। যেমন রাজা তেমনি রানী।

দান-ধ্যান, যাগ-কর্ম—সারা রাজ্য জুড়ে যজ্ঞ যেন লেগেই আছে। রাজ্যের কোথাও কোন অভাব নেই। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। প্রজারা যেন বাস করত সুখের রাজত্বে।

অভাব নেই রাজা-রানীরও। প্রজাদের সকলের কাছেই তাঁরা পান মা-বাবার সম্মান। কিন্তু পেলে কি হবে? যখনই মনে হত, নিজেদের ছেলেপুলে নেই, তখনি মনটা খারাপ হয়ে যেত। পরক্ষণেই অবশ্য তা আবার সামলে নিতেন। বুঝতে দিতেন না কাউকে তাঁদের মনের কষ্ট।

একদিন কিন্তু রানী মালতী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না।

রাজকার্য সেরে অশ্বপতি অন্দরমহলে এসে দেখেন, শুকনো মুখে বসে আছেন রানী। চোখের কোণে জল। আলথালু বেশ। রাজা তো দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। এরই মধ্যে কি এমন ঘটে গেল? কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন রানীকে।

বার বার, অনেকবার জিজ্ঞেস করে বুঝলেন, সন্তান না থাকার জন্যই রানীর মনে অত কষ্ট। সে কষ্ট তো রাজারও। কিন্তু উপায় কি? ভাগ্যে যদি তাঁদের ছেলেপুলে না থাকে, কি করার আছে?

অশ্বপতি অনেক চেষ্টা করেও এবার যখন রানীকে স্বাভাবিক করে

তুলতে পারলেন না, তখন ঠিক করলেন, একবার গুরুদেবের পরামর্শই নেয়া যাক।

গুরুদেব হলেন মহামুনি বশিষ্ঠ। থাকতেন কাছেই এক তপোবনে তপস্যা নিয়ে।

হঠাৎ রানীকে নিয়ে রাজা অশ্বপতি একদিন এলেন সেখানে। প্রণাম জানিয়ে বসলেন।

বশিষ্ঠদেবও সাদরে তাঁদের বসিয়ে জানতে চাইলেন তপোবনে আসার কারণ। রাজাও অকপটে সবই বললেন গুরুদেবকে।

শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন—একটাই মাত্র পথ আছে। তা হল, ভগবতী সাবিত্রীর আরাধনা। স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মাও তাঁর পূজা করেন। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তোমরা যদি তাঁকে তুষ্ট করতে পার, তাহলে তোমাদের আর মনোকষ্ট থাকবে না।

এমনিতেই রাজা-রানী দুই জনেই ছিলেন খুবই ধার্মিক। একটা পথের নিশানা পেয়ে রানী মহিষী আর কালবিলম্ব না করে বসে গেলেন সাবিত্রীর আরাধনায়। অশ্বপতি ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে।

শুদ্ধাচারে থেকে এক মনে মহিষী দিনরাত ডাকেন সাবিত্রীকে—দেবী, কৃপা কর। আমার বন্ধ্যা অপবাদ দূর করে দাও।

এমনি ভাবে ডাকতে ডাকতে মহিষীর কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। কিন্তু সাবিত্রীর দেখা আর মিলল না।

খুবই ভেঙে গেল মহিষীর মন। মুখ শুকনো করে তিনি ফিরে গেলেন প্রাসাদে।

অশ্বপতি দেখে ঠিক করলেন, এবার তিনি নিজেই সাবিত্রীর আরাধনায় যাবেন। দেখবেন, দেখা পান কিনা।

রাজকার্য থেকে কিছুকালের অবসর নিয়ে অশ্বপতি সোজা চলে গেলেন পুষ্কর তীর্থে। স্নান সেরে নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করলেন ভগবতী সাবিত্রীর পূজা-আরাধনা।

দিন-মাস-বছর গেল। আবার বছর এল, আবার গেল। কিন্তু ভগবতীর দর্শন আর পান না রাজা। দেখতে দেখতে কেটে গেল একশোটা বছর।

রাজাকে যেন নেশায় পেয়ে বসেছে। চেষ্টার অসাধ্য কি কিছু আছে পৃথিবীতে? তা যদি না থাকে, তবে অভীষ্ট লাভ তাঁর হবেই।

এমনি যখন তাঁর মনে জেদ, হঠাৎ শুনলেন আকাশবাণী-'অশ্বপতি, সাবিত্রীর দর্শন যদি পেতে চাও, তবে দশ লক্ষ্য বার গায়ত্রী জপ কর।' শুনেই চমকে চোখ মেলে তাকাতেই অশ্বপতি সামনেই দেখলেন মহামুনি পরাশরকে। মুনিবরকে প্রণাম জানাতে তিনিও দিলেন সেই একই পরামর্শ—রাজা, সাবিত্রীর-দর্শন খুব সহজে হয় না। চাই শুদ্ধাচার আর দারুণ নিষ্ঠা। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—একে বলে ত্রিসন্ধ্যা। এই ত্রিসন্ধ্যা যদি এক মনে বসে দশ লক্ষ্য বার গায়ত্রী জপ করতে পার, অবশ্যই তাঁর দর্শন পাবে, আর তোমার অভিলাষও পূরণ হবে। শুনে রাখ রাজা, সেই বেদমাতা, জগৎজননী সাবিত্রীকে দেখতে কেমন। দেখবে, সূর্যের মত জ্বলজ্বল করছে তাঁর শরীর, কাঁচা সোনার রং যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। গায়ে নানা রত্নের অলঙ্কার। হাসি হাসি মুখ। অপরূপ! দেখলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায় রাজা। তুমি এই ভেবে জপ কর, নিশ্চয়ই দেখা পাবে।

অশ্বপতিকে সাবিত্রীর সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে চলে গেলেন পরাশর। আর অশ্বপতিও তাঁর নির্দেশ মত আবার শুরু করলেন আরাধনা।

স্থির চিত্তে অশ্বপতির আরাধনা চলে।

একদিন সত্যিই সত্যিই সেই অপরূপ জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আবির্ভূতা হলেন তাঁর সামনে। মুখে সেই মধুর হাসি। বললেন—অশ্বপতি, আমি জানি, তোমার তপস্যার কারণ। তুমি চাও পুত্র, আর তোমার রানী চায় মেয়ে। নিশ্চিন্তে বাড়ি যাও অশ্বপতি। অবশ্যই তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হবে।

ভগবতী সাবিত্রীর বর পেয়ে মনের আনন্দে অশ্বপতি ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে। আবার শুরু করে দিলেন রাজকার্য।

যথাসময়ে প্রাসাদ আলো করে মহিষীর একটি মেয়ে হল। অপরূপ দেখতে সেই মেয়ে। চোখ-নাক-মুখ-কান সব যেন ছাঁচে গড়া—যেন ঠিক একটি লক্ষ্মী প্রতিমা।

দীর্ঘকাল পর রাজা অশ্বপতির মেয়ে হয়েছে। আনন্দে দুই হাতে রাজা ধনভাণ্ডার উজাড় করে করলেন ধর্ম-বিতরণ। মেয়ের চাঁদপানা মুখ দেখে সকলেই প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেলেন। ভগবতী সাবিত্রীর কৃপায় এই মেয়ে। তাই রাজা তারও নাম রাখলেন সাবিত্রী।

দিনে দিনে যত বড় হয় সাবিত্রী, ততই যেন সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে ওঠে আরও।

কৈশোর পেরিয়ে এল যৌবন। অশ্বপতি এবার চিন্তিত হয়ে উঠলেন মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। রূপে-গুণে ইতিমধ্যেই অতুলনীয় হয়ে উঠেছে সাবিত্রী। কোথায় আছে এমন মেয়ের যোগ্য পাত্র।

খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এলেনও অনেকে। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না রাজার। এদিকে বারো বছর বয়স হয়ে গেল। বিয়ে দিতেই হয়।

রাজাকে খুব চিন্তিত দেখে সাবিত্রী একদিন তাঁকে বলল—বাবা, একটা কথা বলব, শুনবে?

—কি কথা মা? বললেন রাজা—মায়ের কথা ছেলে শুনবে না, তা কি হয়?

—তুমি আমার বিয়ের জন্য বড় বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছ, দেখছি। কেন বল তো, বাবা?

—মেয়ে বড় হলে বাপকে যে চিন্তা করতে হয় মা। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন অশ্বপতি।

—আচ্ছা বাবা, আমি যদি স্বয়ংবরা হই, তোমার আপত্তি আছে? জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী।

—আপত্তি কেন থাকবে মা? তুমি আমার অবুঝ মেয়ে নও। বললেন অশ্বপতি—তোমার মনোমত বর যে তুমি নিজে বেছে নিতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

—তাহলে তুমি আর ও নিয়ে চিন্তা করতে পারবে না কিন্তু।

—বেশ মা, তাই হবে।

এরপর একদিন মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সখীদের সঙ্গে সাবিত্রী বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে শুরু করল দেশ থেকে দেশে, নগর থেকে নগরে। দেখল কত সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক। কতজন যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু একটাকেও মনে ধরল না সাবিত্রীর। সাবিত্রীর বিচার দেখে সখীরাও অবাক। সাবিত্রীও মনে মনে একটুও দুঃখিতই হল। পৃথিবীতে এত মানুষ, কিন্তু তার মনের মত মানুষ একটাও মিলল না কেন?

ঘুরতে ঘুরতে সাবিত্রী এবার এল এক তপোবনে। কত মুনি, ঋষি, যোগী আপন ধ্যানে মগ্ন। দেখতে দেখতে বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে এক তাপস যুবককে দেখে থমকে দাঁড়াল।

দাঁড়িয়ে পড়ল সখীরাও।

সাবিত্রী সেই নবীন তাপসকে দেখিয়ে বলল—সখি, যদি বিয়ে করতে হয় তবে ওকেই করব।

সাবিত্রীর কথা শুনে সখীরা পড়ল মহাবিপদে। রাজার মেয়ে সাবিত্রী। এত রাজপুত্র ছেড়ে শেষে তার পছন্দ হল তাপসকে! মাথায় জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ছাই-ভস্ম মাখা।

সখীরা তখন অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল এমন আচরণ মানায় না, সাবিত্রী। এতে যে রাজারই মাথা হেঁট হবে।

কিন্তু সাবিত্রীর ঐ এক কথা। বলল—জানি না, উনি আমাকে বিয়ে করবেন কিনা। তবু ঐ তাপসকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।

অগত্যা সখীরা এগিয়ে গেল তাপসের কাছে সাবিত্রীকে নিয়ে। জানতে চাইল তাঁর পরিচয়।

মিষ্টি মধুর কথায় তুষ্ট তাপস বললেন—আমার নাম সত্যবান। একসময় ছিলাম রাজপুত্র, থাকতাম রাজপ্রাসাদে। আজও আমি রাজপুত্র, কিন্তু তাপস। থাকি এই বনে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে।

—রাজপুত্র আপনি? সখীরা এবার যেন একটু খুশি হল—কে আপনার

পিতা? কিভাবেই-বা বনবাসী হলেন?

—আমার পিতা রাজা দ্যুমৎসেন। ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে আমার বাবা রাজ্য হারিয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনবাসে আছেন পর্ণকুটিরে। অন্ধ। বললেন সত্যবান—কিন্তু আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না। এখানেই বা আপনারা কেন?

সখীরা সাবিত্রীকে দেখিয়ে বলল—এরই জন্য আমরা এসেছি এখানে। ইনি আমাদের সখী সাবিত্রী। মদ্ররাজ অশ্বপতির মেয়ে। স্বয়ংবরা বেরিয়েছিলেন। দেশে দেশে যোগ্য পতির সন্ধানে।

চুপ করে শুনলেন সত্যবান। দেখলেন মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী।

দেশে ফিরে সখীরা রাজা অশ্বপতিকে জানাল সব কথা। শুনিয়েও দিল সাবিত্রীর সব কথা যে, সত্যবানকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না।

শুনে কিন্তু রাজা কিছুমাত্র দুঃখ পেলেন না। হোক বনবাসী রাজপুত্র সত্যবান, তবুও তাঁর মেয়ের যখন পছন্দ, তখন আর কোন কথাই চলবে না। সত্যবানকে এনে ধূমধামের সঙ্গে অশ্বপতি বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের।

স্বামীর সঙ্গে সাবিত্রীও হল বনবাসিনী।

মহানন্দে কেটে গেল সাবিত্রীর এভাবে এক বছর।

দ্যুমৎসেন যজ্ঞ করেন আর সত্যবান বন থেকে সংগ্রহ করে এনে দেয় কাঠ (সমিধ)।

একদিন এমনিভাবেই সত্যবান বনে গিয়েছে কাঠ সংগ্রহ করতে, সঙ্গে সাবিত্রী। কাছে-পিঠে তেমন কাঠ না পেয়ে সে উঠল একটা গাছে। ডাল কাটে আর ফেলে দেয় নীচে। জড়ো করে সাবিত্রী। হঠাৎ সত্যবান কেমন করে যেন পা পিছলে পড়ে গেল গাছ থেকে। সজোরে এসে আছড়ে পড়ল মাটিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাল।

একটু সেবা করা বা দুটো কথা বলার সুযোগও পেল না সাবিত্রী।

একেবারে আকস্মিক এই দুর্ঘটনা।

তার ওপর সাবিত্রী দেখল নির্দয় যমরাজ এসে তার স্বামীর দেহ থেকে প্রাণপুরুষটাকে টেনে বের করে নিয়ে চললেন।

বিদ্রোহ করে উঠল সাবিত্রীর মন। সে বেঁচে থাকতে যমরাজ তার

স্বামীকে নিয়ে যাবেন? যদি সত্যিই সে সতী-সাধ্বী হয়, যেভাবেই হোক, স্বামীর প্রাণ সে ফিরিয়ে আনবেই।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সাবিত্রী অনুসরণ করল যমরাজের।

এঁকে বেঁকে পথ চলছেন যমরাজ। চলেছে সাবিত্রী তাঁর পিছু পিছু ঠিক সেভাবেই।

চলে এসেছে ইতিমধ্যে অনেকখানি পথ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন যমরাজ। বললেন—তুমি আমার পিছু পিছু কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানে আপনি আমার স্বামীকে নিয়ে চলেছেন, আমিও সেখানেই যাচ্ছি। বলল সাবিত্রী।

—তোমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছি আমি আমার রাজ্যে, যমপুরীতে। তোমার যদি যেতে একান্তই ইচ্ছে থাকে তাহলে দেহে তো সেখানে যেতে পারবে না। বললেন—যমরাজ—তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। তাই মারা গেছে। এবার যাবে আমার রাজ্যে তার কর্মফল ভোগ করতে।

—এটাই কি নিয়ম যমরাজ? জিজ্ঞেস করে সাবিত্রী।

—হ্যাঁ, এটাই নির্দিষ্ট নিয়ম। জীবনে যে যা কাজ করবে, মৃত্যুর পর তাকে তার ফলভোগ করতেই হবে। ভোগ করতে হবে জন্মান্তরেও। দেখ না, পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্য। কেউ গাছ, কেউ পশু, কেউ পাখি, কেউ পোকা, কেউ কীট। কেউ-বা মানুষ হয়েও পামর, করে দুর্বৃত্তের আচরণ, কেউ বা সাধু। কেউ মরে অল্প দিনে। কেউ কেউ ভোগ করে দীর্ঘ সুখী জীবন। সাবিত্রী, সবই কর্মফল। প্রত্যেকেই যে যার কর্মফল ভোগ করছে।

—সবই ঠিক। কিন্তু দেব, কি এমন কর্ম আমি করেছি যে আমাকে বৈধব্য ভোগ করতে হবে? আপনার তো অজানা কিছু নেই। বলুন, স্ত্রীর কাছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের চেয়েও বড় দেবতা হলেন স্বামী। স্বামীসেবাই স্ত্রীর পরম ধর্ম। তাতে তো আমার কোন ক্রুটি ছিল না। ধর্মপথে থেকেও বলুন ধর্মরাজ, আমাকে কেন এই কষ্টভোগ করতে হবে?

সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনে বেশ একটু থতমত খেয়ে যান যমরাজ। এমন প্রশ্নের মুখোমুখি কখনো যে হতে হবে, এ যেন তিনি ভাবতেও পারেন নি। অথচ ঐটুকু মেয়ের মুখে এই প্রশ্ন, খুবই ভাল লাগল তাঁর।

বললেন—তোমার সব পরিচয়ই আমি জানি সাবিত্রী। খুব ভাল লাগল তোমার কথা। একশ পুত্র নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সুখে হাজার বছর ঘর-সংসার কর। আমি তোমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিলাম। নিয়ে যাও।

সাবিত্রী বলল—এতই যদি দয়া করলেন, তাহলে আমার আর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন, দেব।

—বল। আমার শ্বশুর যেন ফিরে পান তাঁর অপহৃত রাজ্য।

—তাই হবে সাবিত্রী। নিশ্চিন্তে ফিরে যাও স্বামীকে নিয়ে।

জীবন ফিরে পেল সত্যবান। দ্যুমৎসেন শুধু দৃষ্টিশক্তিই ফিরে পেলেন না, যা ছিল তাঁর স্বপ্নের অগোচরে, শত্রুপক্ষ অযাচিতভাবে এসে বনবাস থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দিল সিংহাসন, রাজ্য।

সতী-সাধ্বী সাবিত্রীর এই অলৌকিক কীর্তি চিরকালের জন্য অমর হয়ে রইল।

সুযজ্ঞের গোলোক প্রাপ্তি

ভক্ত ধ্রুব-র পুত্র রাজা উৎকল তখন পৃথিবীর রাজা।

যেমন বাবা, তেমনি ছেলে। ভক্ত তো বটেই, তার ওপর দান-যজ্ঞের যেন শেষ নেই তাঁর। প্রতিদিন করে চলেছেন ব্রাহ্মণ, মুনি ঋষি থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণকে ভাঁড়ার উজাড় করে দান—সোনা-দানা, থেকে পেট ভরতি খাবার পর্যন্ত। সব অতিথির আপ্যায়ণ শেষ হয়ে গেলে, তবে রাজা নিজে খেতেন, বসতেন সভায়। মনে কোন বিরক্তি নেই। সদাই হাসিমুখ।

রাজাকে ভালবেসে তাই তাঁর রাজসভা আলো করে থাকতেন অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, লোমশ, দুর্বাসা, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি বড় বড় মুনি-ঋষিরা। আর ব্রহ্মা রাজার এই রাজসূয় যজ্ঞ দেখে আদর করে তাঁকে ডাকতেন 'সুযজ্ঞ' বলে।

সেই থেকে রাজা উৎকল-এর নামই হয়ে গিয়েছিল, সুযজ্ঞ।

এমন যে দানবীর, তাঁকেও পড়তে হল একদিন মহা দুর্বিপাকে।

বেলা প্রায় শেষ। যজ্ঞকর্ম শেষ করে সুযজ্ঞ রাজা নিশ্চিন্ত মনে এসে বসেছেন তাঁর রত্ন-সিংহাসনে। সভা আলো করে মুনি ঋষিরা যে যাঁর আসনে বসে আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এলেন রাজসভায়। কঙ্কালসার দেহ, পরনে কৌপীন, মাথায় একমাথা রুক্ষ চুলের জটা।

সভায় ঢুকেই ব্রাহ্মণ নিয়মমত রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা সুযজ্ঞ কিন্তু যথারীতি আপ্যায়ণ জানালেন না তাঁকে। ব্রাহ্মণ-অতিথিকে

দেখে রাজার যা করার উচিত ছিল—সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো, এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানানো, সেবার উদ্যোগ নেয়া—সেসব কিছুই করলেন না। শুধু দুই-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রতি-নমস্কার করলেন মাত্র।

দেখে ব্রাহ্মণ গেলেন দারুন রেগে।

—শোন রাজা। শুকনো গলায় যেন গর্জন করে উঠলেন ব্রাহ্মণ—শিব আমার গুরু, ভগবান মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ আমার ঈশ্বর। আমি তাঁর দাস। তোমার সভায় আমি প্রার্থী হয়ে আসিনি। এসেছিলাম সাধুদর্শনে। যজ্ঞ করে এই দম্ভ হয়েছে তোমার যে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করলে। আমার অভিশাপে রোগ-ব্যাধি তোমায় গ্রাস করবে, তুমি শ্রীহীন হবে। তোমার দম্ভ চূর্ণ হবে। বলেই পেছন ফিরেই ঠক্ ঠক্ করে বেরিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ।

রাজার তো মাথায় হাত—এ কি সর্বনাশ হল!

পুলস্ত্য, পূরহ থেকে যে সব মুনি-ঋষি সেখানে ছিলেন, তাঁরাও চমকে উঠে আসন ছেড়ে পিছু নিলেন ব্রাহ্মণের। তাঁরা থাকতে তাঁদেরই সামনে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে রাজা কষ্ট পাবেন, তা তো হতে পারে না।

সবাই মিলে গিয়ে ধরলেন ব্রাহ্মণকে। পরিচয় নিয়ে জানলেন, ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, দৈত্যনিধনের জন্য দেবরাজ যে বিশ্বরূপকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়েছিলেন, ইনি তাঁরই নাতি সুতপা। তপস্যা করে সঞ্চয় করেছেন অনন্ত শক্তি।

ব্রাহ্মণকে ঘিরে ধরে সবাই মিলে করতে শুরু করলেন অনুরোধ—ব্রাহ্মণ, রাজা অন্যায় করেছেন ঠিকই। তাই বলে কি তাঁর কোন ক্ষমা নেই? তাঁর এত পূণ্যকর্ম কি সব বিফলে যাবে?

বারবার মুনি-ঋষিদের ঐ কথা শুনতে শুনতে একসময় স্থির হলেন ব্রাহ্মণ সুতপা। তপস্বীদের ধর্মই তাই—কোথাও অনাচার দেখলে যেমন রাগে দপ্ করে জ্বলে ওঠেন, আবার শান্তও হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে।

সুতপাকে শান্ত হতে দেখে মুনিরা রাজা সুযজ্ঞকে ডাকলেন। বললেন—ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে যথোচিত সৎকার করুন।

অভিশাপের ফলে ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেছে রাজার। তবু, সমাদরে তাঁকে নিয়ে গেলেন প্রাসাদে। সাধ্যমত সেবা করলেন।

সন্তুষ্টও হলেন সুতপা।

কিন্তু অভিশাপ-মুক্ত হবার উপায়?

সুতপা বললেন—আমার এই অভিশাপ তোমার ক্ষতি করার জন্য নয়। তোমার মধ্যে অহঙ্কার জন্মেছিল। যত ভাল কাজই তুমি করা না কেন, মনে অহঙ্কার জন্মালে, তার সব সুফল নষ্ট হয়ে যায়। তোমাকে অহঙ্কার-মুক্ত করার জন্যই আমার এই অভিশাপ।

—কিভাবে, এ থেকে আমি মুক্ত হব, ব্রাহ্মণ?

—শোন, রাধানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও। তোমার এই যজ্ঞে ব্রহ্মাদি-দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অনেক কিছুই দিতে পারেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ কৃপা না করলে, তুমি যা পাবে, তা সব মিথ্যে হয়ে যাবে। রাজা, আমার কথা শোন। তোমার ছেলের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দাও। তুমি বনে গিয়ে সেই রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর। তাহলে অবশ্য শাপমুক্ত হবে। কিন্তু রাজা, তোমাকে একা যেতে হবে। রানীকে রেখে যাবে তোমার ছেলের কাছে।

—আপনার অভিশাপে আমি যে ইতিমধ্যেই দুর্বল হয়ে পড়েছি। কেমন করে বনে যাব?

ব্রাহ্মণ সুতপা বললেন—তুমি রাধার নাম জপ কর। রাধাকে ডাকো মন-প্রাণ দিয়ে। তাহলে পারবে। জান, কে এই রাধা? ইনি হলেন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। বৈকুণ্ঠে যেমন চতুর্ভুজ নারায়ণের শক্তি হলেন লক্ষ্মী। তারও ওপরের গোলোকে সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হলেন রাধা। এই গোলোকেই আছে শতশৃঙ্গ পর্বত। তাকে ঘিরে বয়ে চলেছে বিরজা নদী। কচি ঘাসের মত গায়ের রং পরনে পীতবসন, মুরলীধরন দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ সব সময় সেখানেই থাকেন রাধার সঙ্গে, রাসমণ্ডপে। শত শত গোপিনীদের নিয়ে তিনি সেখানে সর্বদা করে চলেছেন রাসলীলা।

চুপ করে রাজা সুযজ্ঞ সুতপার মুখে শোনেন রাধাকৃষ্ণের কথা।

—গোলোকে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও রাধাকে একবার সুদামার অভিশাপে পৃথিবীতে মানুষের ঘরে গোপিনী হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল।

—কেন? কি অপরাধ ছিল রাধার? জিজ্ঞেস করেন রাজা।

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না ঠিকই, তবুও ভালবাসতেন রাধারই আর এক সাথী বিরজাকে। মনে মনে সন্দেহ হয়েছিল রাধার। তাই তাঁকে নজরে রাখার জন্য জনকয়েক গোপীকে

রেখেছিলো গুপ্তচরী করে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিরজার কাছে গেছেন, খবর পেয়ে রাধা গোপিনীদের নিয়ে আসছেন শুনে শ্রীকৃষ্ণ পালালেন। বিরজাও ভয়ে নদী হয়ে বইতে শুরু করল বৃন্দাবনে। সেখানে দেখতে না পেয়ে রাধা শ্রীকৃষ্ণের আবাসে এসে তাঁকে যাচ্ছেতাই করতে শুরু করলেন। শুনে শ্রীকৃষ্ণ হাসলেন বটে কিন্তু কৃষ্ণসখা সুদামা খুব রেগে গিয়ে রাধাকে যা-তা বলে বসল। রাধা তখন কৃষ্ণকে ছেড়ে পড়লেন সুদামাকে নিয়ে। তাকে দিলেন অভিশাপ- 'মর্ত্যে গিয়ে দৈত্যকুলে জন্ম নাও।' সুদামাও দিল পালটা অভিশাপ।, 'তুমি মর্তে গিয়ে মানুষের ঘরে জন্মাও।' সুদামা হয়েছিল শঙ্খচূড়। পরে মহাদেব তাকে উদ্ধার করেছিলেন। আর দ্বাপরে বৃন্দাবনে গোপ বৃষভানুর ঘরে রাধা জন্ম নিলেন, রাধা নামেই। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে তাঁর অন্তরের সম্পর্ক, তাঁকে ছেড়ে কি রাধা থাকতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও তাঁকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। তিনিও মর্ত্যে অসুরদের দমন করার জন্য বাসুদেব নামে এলেন গোপ নন্দের ঘরে। এদিকে বৃষভানুর ঘরে যখন রাধা বড় হয়ে উঠলেন তখন এল তাঁর বিয়ে দেবার সময়। আয়ান নামে এক গোপের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। সবাই দেখল রাধার সঙ্গেই তার বিয়ে হল, আসলে কিন্তু রাধা গোপনে চলে গেলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে, বিয়ে হল রাধার আয়ানের ছায়ার সঙ্গে। যেমন রাবণ যে সীতাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে আসল সীতা ছিল না, ছিল নকল সীতা—ঠিক সেইরকম। অনন্ত শক্তি রাধা—সর্বেশ্বরী। সনাতন

ভগবান দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বর। যাও রাজা, যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে যা বললাম তাই করো। বলে গেলেন সুতপা।

রাজা সুযজ্ঞ যে দোনামনায় ছিলেন, এখন আর তা নেই। চলে গেলেন পুষ্কর তীর্থে। বসলেন রাধার আরধনায়।

কেটে গেল এক হাজার বছর নিথর, নিশ্চল তপস্যায়।

হঠাৎ একদিন ধ্যাননেত্রে রাধা দেখলেন—অপূর্ব এক বিমানে কে এক দিব্য রমণী যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। এগিয়ে আসছেন খুব দ্রুতবেগে। কাছাকাছি আসতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন রাজা—এই তো, এই তো আমার আরাধ্যা দেবী রাধা।

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজা সুযজ্ঞের মাটির দেহ রইল মাটিতে পড়ে। ধারণ করলেন দিব্য এক রূপ। রাধা এসে তাঁকে সাদরে বিমানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন গোলোকে। সুযজ্ঞ দেখলেন—অপরূপ এক ধাম/দাঁড়ায়ে সেখানে মুরলীধারী শ্যাম। বঙ্কিম ঠাম।

আনন্দ....আনন্দ......অপার আনন্দের জোয়ারে যেন ভেসে গেলেন সুযজ্ঞ।

গণেশের ইতিকথা

পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর সঙ্গে মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল শিবের। বহু তপস্যার পর মনের মত স্বামী পেয়ে পার্বতীও মহা খুশি। মনের আনন্দে ঘর বেঁধেছেন দুজনে কৈলাসে। পার্বতী ঘুরে বেড়ান যেখানে-সেখানে স্বামীর সঙ্গে। মহাযোগী, মহাশক্তিধর শিব যাঁর স্বামী, তাঁর আবার ভয় কি ?

বহু বছর কেটে গেল বিয়ের পর, কিন্তু ছেলেপুলে হল না। ছেলেপুলে না থাকলে কি সংসার মানায় ?

প্রথম একটি ছেলের মুখ যা-ও-বা দেখার আশা ছিল পার্বতীর, দেবতাদের চক্রান্তে তা-ও নষ্ট হয়ে গেল। তাই তাঁর মনে খুব দুঃখ। পর্বতরাজ হিমালয় আর পার্বতীর মা মেনকারও দুঃখও কম নয়।

যাই হোক, কিছুতেই আর ছেলেপুলে হয় না দেখে স্বামীর পরামর্শ নিয়ে পার্বতী ঠিক করলেন, পুত্র-কামনায় পুণ্যক ব্রত করবেন।

শিবের ঘরনী করবেন ব্রত—এ কি যা-তা ব্যাপার?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যেখানে ছিলেন, খবর পেয়েই নানারকম খাবার-দাবার থেকে শুরু করে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী আনতে শুরু করলেন। খাদ্যদ্রব্যের পাহাড় জমে গেল কৈলাসে। স্বয়ং কুবের হলেন ভাঁড়ারী। স্বর্গালোকে যত দেবতা ছিলেন এসে হাজির হলেন। গন্ধর্বলোক, কিন্নরলোক থেকেও আসতে লাগলেন দলে দলে। এলেন সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, নর, নারায়ণ—সব খ্যাতিমান মুনি-ঋষিরা। বড় বড় উনানে জ্বলল আগুন। ভাল ভাল তরিতরকারি থেকে ভাত-পায়েস-পিঠে তৈরি হতে শুরু

হল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর তত্ত্বাবধানে। এল যজ্ঞের জন্য কাঠের ওপর কাঠ, ঘিয়ের ওপর ঘি। শিবের নির্দেশে পার্বতী সনৎকুমারকে করলেন যজ্ঞের পুরোহিত।

একদিকে চলেছে সমানে শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি। থালির পর থালি ঘি পুড়তে লাগল আগুনে, আর একদিক চলল 'দাও দাও, নাও নাও, খাও খাও'—সে এক এলাহি ব্যাপার।

আর এদিকে পার্বতী শুদ্ধাচারে বসে, দিনরাত শিবের কথামত শুধু ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে চললেন কুশের আসনে বসে।

এক বছর ধরে চলল সেই মহাযজ্ঞ। পার্বতী ব্রতের নিয়ম মেনে এক বছরের মধ্যে ছ-মাস করলেন হবিষ্যি (আতপ চালে ফ্যান ভাত আর সেদ্ধ), তার পর পাঁচ মাস খেলেন ফল-মূল। তারপর একমাসের মধ্যে পনের দিন শুধু ঘি, বাকি পনের দিন খেলেন শুধু জল!

ব্রতের শেষ দিন। খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সনৎকুমার যজ্ঞ করলেন।

যজ্ঞ শেষ করে পার্বতীকে সনৎকুমার বললেন—পুরোহিতের দক্ষিণা দাও, পার্বতী!

—কি দক্ষিণা পেলে আপনি খুশি হবেন? জানতে চাইলেন পার্বতী।

—তোমার স্বামী শিবকে আমায় দক্ষিণা দাও। নিঃসঙ্কোচে বললেন সনৎকুমার। শুনেই পার্বতীর চোখের সামনেটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। মাথা ঘুরে গেল। দক্ষিণা হিসেবে এ কি চেয়ে বসলেন ব্রাহ্মণ! স্বামীকে দক্ষিণা হিসেবে দেয়া কি কখনও কোন স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে দেবগুরু বৃহস্পতি পর্যন্ত পার্বতীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ব্রতের যা নিয়ম তা তো পালন করতে হবে। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পেয়ে যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে যে ব্রতের ফল পাবেন না পার্বতী। সবাই মিলে বলতে শুরু করলেন, ব্রাহ্মণ দক্ষিণা হিসেবে যা চেয়েছেন, পার্বতী যেন তা

হাসিমুখে দেন। তাতে তাঁর কোন অমঙ্গল হবে না।

পার্বতীও সমানে করে চললেন তাঁদের বিরোধিতা। আগের জন্মে এই স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের ঘরে প্রাণ দিয়ে এ জন্মে অনেক তপস্যায় তাঁকে পেয়েছেন। না, সেই স্বামীকে ছেড়ে তিনি কোন মতেই থাকতে পারবেন না। এদিকে পুরোহিত সনৎকুমারও নাছোড়—দেরি কোরো না, পার্বতী। যা চেয়েছি দিয়ে দাও। নিয়ে হাসিমুখে চলে যাই।

ঠিক এই সময় বৈকুণ্ঠ থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ এসে হাজির হলেন সেখানে। তাঁকে দেখে তো সকলেই তটস্থ হয়ে উঠলেন। ব্রহ্মা-মহেশ্বর থেকে যত দেবতা উপস্থিত ছিলেন তাঁকে রত্ন-সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর স্তব-স্তুতি করলেন।

একটু জিরিয়ে নিয়ে দেবগণকে বললেন নারায়ণ—ছি, ছি! পার্বতীকে নিয়ে তোমরা এ কি কাণ্ড করলে বল তো। স্ত্রী ছাড়া কি স্বামী থাকতে পারে? না, স্বামী ছাড়া স্ত্রী থাকতে পারে ? দু-জনে এক সঙ্গে না থাকলে কি আমি সৃষ্টি করতে পারি ? আর তোমরা তাতেই বাধা দিয়ে বসলে? আবার ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট না হলে যজ্ঞের ফলও পাওয়া যায় না।

তারপর পার্বতীকে বললেন—পার্বতী, উনি যা চাইছেন, দিয়ে দাও। ভয়ের কিছু নেই। আমি তো আছি।

বলে চলে গেলেন নারায়ণ।

অগত্যা কি আর করেন পার্বতী। স্বামীকে দক্ষিণা হিসেবে তুলে দিলেন পুরোহিত সনৎকুমারের হাতে।

সনৎকুমারও বগলদাবা করলেন শিবকে। দেবতারাও সন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু পার্বতীর মনে সে কি কষ্ট!

অনেক ভেবে-চিন্তে পার্বতী বললেন—দেখুন, আমি মেয়ে মানুষ, মুখ্যু-সুখ্যু। আপনাদের মত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য আমার নেই। তবে শুনেছি, শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণকে গাভী দানের তুল্য শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই। আমি এক লক্ষ গাভী দিচ্ছি। দয়া করে তাঁর বিনিময়ে আপনি আমার স্বামীকে মুক্তি দিন।

শুনে যেন খাই খাই করে উঠলেন সনৎকুমার—এ কি কথা! একবার দিয়ে আবার বদল করতে চাইছ ? এর নাম তোমার ব্রত ? আমি গরিব

ব্রাহ্মণ, অত গাভী নিয়ে কি করব ? তার চেয়ে বরং এ ভাল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব।

পার্বতীও স্থির করলেন, এ জীবন তিনি আর রাখবেন না। কি হবে তাঁর বেঁচে থেকে ?

এক মনে ডাকতে লাগলেন শ্রীহরিকে। ডাকছেন তো ডাকছেন। চোখের জলে মনে মনে ডেকেই চলেছেন—কোন অপরাধ তো করি নি ভগবান। তবে কেন এমন হল ? ছেলের জন্য তোমাকে তুষ্ট করার ব্রত করলাম বিনিময়ে স্বামীও গেলেন। কি আর করব এ জীবন রেখে ?

ঠিক এমন সময় মাঘ মাসের শীতের কুয়াশা ভেদ করে আকাশ যেন দুলে উঠল আলোর বন্যায়। সচকিত হয়ে উঠলেন দেবতারা। পার্বতী দেখলেন—সর্বাঙ্গে শ্বেত-চন্দন, গলায় বনমালা, হাতে বাঁশি, কিশোর শ্রীহরি এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। মুখে তাঁর সুন্দর হাসি। সঙ্গে সঙ্গে পার্বতীর মন যেন বলে উঠল—আহা! ঠিক ঐরকম যদি একটা ছেলে হয় তাঁর!

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি। মিটিমিটি হেসে বললেন—মনে কোন সঙ্কোচ রেখো না পার্বতী। তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আমারই মত ছেলে হবে তোমার।

দেবতারাও শুনলেন সে কথা। তখন সবাই মিলে সনৎকুমারকে ডেকে বললেন—সনৎকুমার, শিবকে পার্বতীর কাছে ফিরিয়ে দাও। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

আবার স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন পার্বতী। মনে আর কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই। আবার দিন কাটে মহানন্দে।

ব্রতের ফলে যথাসময়ে সন্তান পেলেন পার্বতী। এতদিন বাদে মা হতে পেরেছেন পার্বতী। আনন্দ আর ধরে না। যদিও জানেন, তাঁর এই সন্তান আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীহরি! তবু ছেলে তো বটে। কোলে তুলে নিয়ে সে কি আদর!

অযোনিসম্ভব (মায়ের গর্ভ থেকে যে ভূমিষ্ঠ নয়) সন্তান, দেখতে অপরূপ সুন্দর। জন্মেই সে কিশোর।

খবর পেয়েই দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, মুনি, ঋষি যে যেখানে ছিলেন সকলেই ছুটে এলেন ছেলের জন্য মঙ্গলকামনা নিয়ে আশীর্বাদ করতে।

এলেন দাদু-দিদিমাও। পার্বতীও সকলকে আসতে দেখে মহা খুশি। আপ্যায়নেরও ত্রুটি রাখলেন না একটুও।

ব্রহ্মা জানালেন আশীর্বাদ। বললেন—চারদিকে তোমার যশ ছড়িয়ে পড়ুক। সবার আগে তুমিই হবে পূজ্য।

বিষ্ণু আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—তুমি জ্ঞানী হও। শিবের মত তোমার পরমায়ু হোক। আমার মত তুমি পরাক্রমশালী হও। ধর্মরাজ বললেন—তুমি ধার্মিক, নির্ভীক, দয়ালু হও। শ্রীহরির প্রতি তোমার যেন অবিচল নিষ্ঠা থাকে।

এলেন দাদু হিমালয়। আদর করলেন। আশীর্বাদ জানালেন—সব সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করবে।

বাবা মহাদেব আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—আমার মত তুমি দাতা হও। ধীর, স্থির, পুণ্যবান, বিদ্বান আর হরিভক্ত হও।

লক্ষ্মীদেবী প্রাণ খুলে আশীর্বাদ জানালেন—আমার মত সতী-সাধ্বী বউ হোক তোমার। কোন দিন যেন তুমি অভাবের মুখ না দেখ।

সরস্বতী গণেশের গালে চুমো দিয়ে বললেন—তুমি কবি হবে তোমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর হোক।

দিদিমা মেনকা আশীর্বাদ জানালেন—রূপে-গুণে অতুলনীয় হও ভাই। বীর হও, গম্ভীর হও।

মা পার্বতী আশীর্বাদ জানালেন—বাছা আমার, তুমি তোমার বাবার মত মহাযোগী, মৃত্যুঞ্জয় হও। কেউ যেন তোমার কাছ থেকে মনে কোন কষ্ট না পায়।

আরও যাঁরা ছিলেন, প্রত্যেকেই পার্বতীর ছেলে গণেশকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর শিবের সভা আলো করে এসে বসলেন সব দেবতা, মুনি-ঋষিরা। পার্বতীর ছেলে হয়েছে শুনে গন্ধর্ব, কিন্নরদের মনে এত আনন্দ যে তারা অবিরাম নাচ-গান করে চলেছে। ভুরিভোজও কিছু কম হচ্ছে না সভায়।

অন্দরমহলে গণেশকে কোলে নিয়ে পার্বতী। দ্বারে রক্ষী শিবের অনুচর বিশালাক্ষ।

কৈলাসে শিবের প্রাসাদে দেবসভায় যখন চলেছে এমন আমোদ-প্রমোদ, তখন এলেন সূর্যপুত্র শনি। কুচকুচে কালো গায়ের রং, মুখে সব সময় কৃষ্ণ নাম।

শনিকে এত পরে আসতে দেখে মহাদেব বললেন—ছিঃ ছিঃ! তুমি কেমন গো শনি? আমার ছেলে হয়েছে, কত দূর দূর থেকে সবাই ছুটে দেখতে এসেছেন কত আগে। আর তুমি এলে এখন? আমার ওপর অভিমান হয়েছে বুঝি?

—না না, তা নয়। আপনার ওপর আবার অভিমান কিসের? বললেন—যদি অনুমতি দেন তাহলে ছেলের মুখ দেখে আসি।

—অনুমতি? যেন আকাশ থেকে পড়লেন মহাদেব—আমার ছেলের মুখ দেখবে তুমি আর তার জন্য অনুমতি চাইতে হবে তোমাকে আমার কাছে? যাও, যাও।

অন্দরমহলের দ্বারে যেতেই পথরোধ করে দাঁড়াল বিশালাক্ষ।

—দাঁড়াও এখানে। এখন আমি শিবের হুকুম-টুকুম মানি না। ভেতরে মা-কে জিজ্ঞেস করে আসি তিনি যদি অনুমতি দেন তবেই যেতে পাবে।

অগত্যা চুপ করে শনিকে দাঁড়াতে হল দ্বারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ফিরে এল বিশালাক্ষ। মায়ের অনুমতি মিলেছে। শনি যেতে পারেন ভেতরে গণেশকে দেখতে।

ভেতর ঢুকলেন বটে শনি, গেলেনও কাছাকাছি। কিন্তু গিয়েই মাথা নিচু করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দেখে পার্বতী তো অবাক।

—হঠাৎ কি হল তোমার শনি, মুখ তুলে আমার ছেলের দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

আমতা আমতা করে ওঠেন শনি।

—আরে, কি হল তোমার তাই বলবে তো! অত আমতা আমতা করছ কেন?

অনেকক্ষণ পর ঘাড় নিচু করে রেখে, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন শনি—আমার আসটা ঠিক হয় নি।

—কেন? শুনে অবাক হলেন পার্বতী।

—আমি দেখলে যদি আপনার ছেলের কোন ক্ষতি হয়।

— কি রকম? এ কথা বলছ কেন? জিজ্ঞেস করে পার্বতী।

—দুর্ভাগ্য আমার। শ্রীকৃষ্ণের জপে মগ্ন ছিলুম, আমার স্ত্রী কি যেন একটা অনুরোধ করেছিল। শুনতে পাই নি। রেগে গিয়ে তাই সে অভিশাপ দিয়ে বসেছিল, যার দিকে তাকাব তারই সমূহ ক্ষতি হবে। সেই থেকে ঐ অভিশাপ আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। এখানে আসার আগে সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। বলে শনি বললেন—আপনার ছেলের মঙ্গল হোক। আমি যাই।

সব শুনেও কিন্তু বাধা দিলেন পার্বতী।

—দাঁড়াও শনি। এক ভগবান শ্রীহরি নারায়ণ ছাড়া আর কে ক্ষতি করতে পারে? আমার ছেলের ভাগ্যে যদি কোন ক্ষতি লেখা থাকে তাহলে তার ক্ষতি হবেই। আমি বলছি, আমার ছেলের মুখের দিকে তাকাও। তাকে আশীর্বাদ কর।

এবার শনি পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। তাকালেও সর্বনাশ, আবার না তাকিয়ে ফিরে গেলেও পার্বতী হবে রাগ। আর সেই রাগের বশে যদি আবার কোন অভিশাপ দিয়ে বসেন।

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে একটা চোখ বুজে অপর চোখ একটু খুলে যেই না শনি তাকালেন পাবর্তীর কোলে গণেশের দিকে অমনি মুহূর্তে ঘটে গেল সর্বনাশ। অমন টলটলে চাঁদের মত মুখ গণেশের, কে যেন খুর দিয়ে গলা থেকে কেটে উধাও করে দিল সেখান থেকে। প্রাণ হারিয়ে ছেলে ঢলে পড়ল মায়ের কোলে। বয়ে গেল রক্তের নদী। সঙ্গে সঙ্গে শনিও ভয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। না জানি এবার তাঁর কপালে আবার কি আছে।

ছেলের অবস্থা দেখে পার্বতী তো হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলেন.... এ কি করলে নারায়ণ? এত কষ্টে ছেলেই যদি দিলে, তবে এ সর্বনাশ কেন করলে তুমি?

অন্দরমহল থেকে পার্বতীর কান্না এসে পৌছল দেবসভায়। থেমে গেল

গন্ধর্ব কিন্নরের নাচগান। রত্ন-সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে দেবতা থেকে মুনি-ঋষিরা উঠে ছুটে আসতে লাগলেন সেখানে,—কি হল, কি হল?

এসে তাঁরাও ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক। পার্বতীর কোলে আছে পড়ে প্রাণহীন গণেশ। ঘরে যেন রক্তের সমুদ্র। অদূরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শনি। আকুলি-বিকুলি করছেন পার্বতী।

গণেশের অমন সুন্দর মুখটা কোথায় গেল? ঘরের চারদিক তাকিয়ে দেখলেন দেবতারা। কোথাও তো নেই।

কেউ জানতেও পারেন নি যে গণেশের মুণ্ড ইতিমধ্যে চলে গিয়েছিল গোলোকে। আর ভগবান শ্রীহরি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলেন গোলোক ছেড়ে।

কাঁদতে কাঁদতে মনের দুঃখে প্রায় পাগলের মত হয়ে গেলেন পার্বতী। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে কটমট করে তাকালেন তিনি শনির দিকে। দুই চোখের জল এখন শুকিয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে আগুন।

—তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ করলে শনি। পার্বতীর গলা যেন গর্জন করে উঠল—আমি তোমায় অভিশাপ দিলাম, তুমি সারা জীবন খোঁড়া হয়ে থাক।

যেই পার্বতী শনিকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন দেবতারা—এ কি করলেন পার্বতী।

শনির বাবা সূর্যদেবও সেখানে দাঁড়িয়ে। ছেলের ওপর পার্বতীর অভিশাপ শুনে তিনিও গেলেন দারুন রেগে। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠলেন—আমার ছেলে কি অপরাধ করেছে পার্বতী যে তুমি ওকে অভিশাপ দিলে? তুমি অনুমতি দিয়েছিলে তাই ও তোমার ছেলের মুখ দেখতে গিয়েছিল, নচেৎ তো ও দেখতে চায় নি। বিনা অপরাধে তোমার অভিশাপে আমার ছেলে খোঁড়া হল। শোনো, আমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তোমার ছেলে বেঁচে উঠবে বটে, কিন্তু বিকলাঙ্গ হবে।

অভিশাপ দেবার পরেই কিন্তু পার্বতীর রাগ পড়ে গিয়েছিল। মনে মনে অনুশোচনাও হয়েছিল, তিনি কাজটা ঠিক করেন নি। কিন্তু এখন তো আর কোন উপায় নেই। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ছেলে তোমার খোঁড়া হলেও গ্রহরাজ হবে।

এদিকে কৈলাসে যখন চলেছে এই কাণ্ড ওদিকে ভগবান নারায়ণ বিমান নিয়ে হু হু করে উড়ে আসছেন গোলোক থেকে কৈলাসের দিকে। আসছেন চারদিক তাকাতে তাকাতে। জ্ঞান-বুদ্ধি-নিরহঙ্কার দয়া-মায়া প্রভৃতি যে সব গুণ নিয়ে জন্মেছিল গণেশ, ঠিক তার উপযোগী একটা মাথা এখনই যে তাঁকে জুড়ে দিতে হবে গণেশের শরীরের সঙ্গে। আর অবিকল সেই ধরনের মাথা কোথায় আছে, তাও অজানা নেই সর্বজ্ঞ ভগবানের। এদিকে লক্ষ্যও রাখতে হবে ভগবানকে—যে যেমন কাজ করেছে, তাকে সেই রকম ফল দিতে হবে। সূর্যশাপে পার্বতীর ছেলে বেঁচে উঠবে কিন্তু বিকলাঙ্গ হবে, তাও যেমন অজানা নেই শ্রীহরির, তেমনি অজানা নেই শিবের ওপর মহামুনি কশ্যপের অভিশাপ।

বহুকাল আগে মালী আর সুমালী নামে দু-জন শিবভক্তের ওপর হঠাৎ সূর্যদেব খেপে গিয়ে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাঁদের একেবারে মেরে ফেলতে গিয়েছিলেন। শিবভক্ত অসুর দুই ভাই মনে-প্রাণে শঙ্করকে ডাকলেন। শিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। রেগে গিয়ে ছুঁড়ে শুল মেরেছিলেন সূর্যদেবকে। শূলের আঘাতে সূর্যদেব এমনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সূর্যদেবের বাবা কশ্যপ মাথা ঠিক রাখতে না পেরে শিবকে দিয়ে বসেছিলেন নিদারুণ অভিশাপ—তোমার ছেলে মুণ্ডহীন হবে।

যদিও স্বয়ং নারায়ণের অংশে জন্ম হয়েছে গণেশের, তবুও পাছে ব্রহ্মবাক্য মিথ্যা হয়, তাই সবই করতে দিতে হচ্ছে ভগবানকে। এবার সূর্যের অভিশাপ—বিকলাঙ্গ সন্তান।

যাই হোক, সর্বজ্ঞ নারায়ণ গরুড়ের পিঠে চেপে এসে হাজির হলেন পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে। দেখলেন শুয়ে আছে গজরাজ, একমাত্র তার মাথাই হতে পরে গণেশের। উত্তরদিকে মাথা রেখে চিৎপাত হয়ে গজরাজ ঘুমোচ্ছে।

গজরাজের কুতকুতে দুটো চোখ, বিরাটকায় ধবধবে সাদা দুটো দাঁতের মাঝে বেশ মোটা সোটা বলিষ্ঠ একটা শুঁড়। দুই-পাশে বিশালকায় দুটো কুলোর মত কান। জাতে হাতি, এমনিতেই বোকা। তাই বলে,

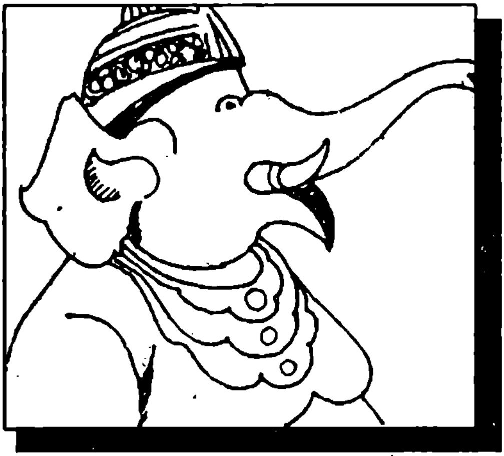

হস্তিমূর্খ! কিন্তু এই গজরাজ ছিল একটু অন্য জাতের। সে ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন—ঐরাবত।

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র আসছিলেন ঐরাবতে। পথের মাঝে মহামুনি দুর্বাসা ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন একটা পারিজাতের মালা। দিয়ে বলেছিলেন—দুর্লভ এই মালা গলায় রাখলে জ্ঞানে-গুণে-ঐশ্বর্যে-সবদিক থেকে সে হবে সবার সেরা। সকলের কাছ থেকেই সে সম্মান পাবে, পুজো পাবে। দেবরাজ সেটি নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাহন ঐরাবতের গলায়। দেখে দুর্বসা মুনি রেগে গিয়ে যেই ইন্দ্রকে বলেছিলেন, 'লক্ষ্মীছাড়া হও'—সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের শুরু হয়ে গিয়েছিল চরম দুর্দশা। অমন অমরাবতী হয়ে গিয়েছিল শ্মশান। এমন কি, ঐরাবতও চলে গিয়েছিল তাঁকে ছেড়ে।

ঐরাবতকে দেখামাত্রই নারায়ণ ঝপ করে তার সেই দুর্লভ মাথাটা কেটে নিয়ে অন্য একটা মাথা সেখানে বসিয়ে সাঁ করে চলে এলেন কৈলাসে। সোজা অন্তঃপুরে গিয়ে যেই গণেশের শরীরের সঙ্গে মাথাটা লাগিয়ে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন অমনি উঠে বসল গণেশ।

মুখটা হাতির হয়ে গেল দেখে পার্বতীর মনে যে একটু দুঃখ হল না তা নয়, কিন্তু আর উপায়ই-বা কি আছে। হাজার হোক ছেলে। স্বয়ং ভগবান তো এসে তাকে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

পার্বতীর মনের দুঃখ বুঝতে পেরে নারায়ণ বললেন—এর জন্য মনে কোন ক্ষোভ রেখো না পার্বতী। আমি বলছি, তোমার ছেলে গণেশ যেমনটি চেয়েছিলে ঠিক তেমনটি হবে। তোমার ছেলে শুধু গনেশ নামেই পরিচিত হবে না—লম্বোদর, গজানন, একদন্ত, শূর্পকর্ণ, হেরম্ব, বিঘ্নেশ, বিনায়ক-এসব নামেও সকলের কাছ থেকে সবার আগে পুজো পাবে।

ভাগ্যকে মেনে নিয়ে পার্বতী মনের আনন্দে ছেলেকে তুলে নিলেন কোলে। দেবতারাও একবাক্যে তা স্বীকার করে নিলেন। আর যাবার আগে নিজেদের যা সবচেয়ে প্রিয় সেই জিনিসটি দিয়ে গেলেন তাঁকে।

সেই থেকে গজানন হয়েও গণেশ যেমন মা-বাবার কাছে রইল, অতি প্রিয় ছেলে হয়ে, তেমনি পৃথিবীতে সিদ্ধিদাতা গণেশ হিসেবে পুজো পেতে শুরু করলেন।

গজানন হলেন একদন্ত

ভগবান শ্রীহরি যখন গজরাজ ঐরাবতের মুণ্ড কেটে এনে গণেশের দেহের সঙ্গে জুড়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, তখন শুঁড়ের দুইপাশে তার দুটো সেই বিরাটকায় দাঁতই ছিল। ঝকঝকে ধবধবে সাদা দাঁত দুটো যেন মুক্তোর তরোয়াল।

তাই নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল গজানন গণেশ। দেখে দেখে একটা ভাল মেয়ের সন্ধান পেলেন পার্বতী, নাম তার পুষ্টি। মহা ধুমধামে ছেলের বিয়েও দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে গজাননের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে,জ্ঞানে, সত্যিই তার তুল্য মেলা ছিল দুষ্কর। তেমনি যার যা অসুবিধে হতো,গণেশের কাছে একবার প্রার্থনা জানালেই হল। যত দুঃসাধ্যই হোক না, গজানন তা করে দিতেন সহজেই। শক্তিতেও কিছু কম যেতেন না। কিন্তু ছিলেন দারুণ সংযমী। তাঁকে বড় একটা লড়াই-টড়াই করতে কেউ দেখেনি। কাজ করতেন ঠাণ্ডা মাথায়। তাই সকলের ভালবাসাও পেতেন।

কৈলাসে একদিন গণেশের ভাই কার্তিকের সঙ্গে প্রাসাদ-দ্বারে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ পরশুরাম এসে হাজির। ঋষি জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম! এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, টানা-টানা দুটো চোখ লাল। দুই বাহুতে দুই কবচ। কাঁধে কুঠোর। মাংসপেশীগুলোতে এত ফুলে উঠেছে, মনে হবে স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়বে এখনই।

দু-ভাইকে উপেক্ষা করে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে যাবেন পরশুরাম, বাধা দিলেন যুবক গজানন—কোথায় যাচ্ছ?

কটমট করে পরশুরাম তাঁর দিকে তাকালেন একবার। এর আগে এতগুলো দেউড়ি পেরিয়ে এলেন। বাধা দেয়াতো দূরের কথা। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করারও সাহস পায় নি, এখন কোথাকার এক ডেঁপো ছোকরা, তাও হাতির মাথা, তাঁকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করে কিনা, কোথায় যাচ্ছ? রাগে যেন পিত্তি জ্বলে গেল পরশুরামের। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে একটু বিদ্রুপ করেই বললেন—তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে নাকি? আমি যাচ্ছি আমার গুরুদেব শিবের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম জানাতে।

গণেশ বলল—এখন ভেতরে যাওয়া হবে না।

—কেন?

—মা-বাবা এখন বিশ্রাম করছেন। বিশ্রাম সেরে উঠলে আমরাও যাব, তুমিও যাবে। বেশ শান্ত কণ্ঠে বলল গণেশ।

—বিশ্রাম! গুরুদেব আর গুরু-মা বিশ্রাম করছেন? হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে পরশুরাম বললেন—বিশ্রাম আবার কি? আর যদি বিশ্রামই নেন, তাতেই বা কি হয়েছে? পথ ছাড়ো।

—না। এখন কোন মতেই যাওয়া হবে না। গণেশের সেই এক কথা।

পরশুরাম ভাবলেন, এ তো আচ্ছা ঝামেলা শুরু করল! কোথায় একবার গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে চলে যাবেন ঠিক করেছিলেন, আর এ ছোকরা কি ঝঞ্ঝাট আরম্ভ করল।

—শোন, আমি পরশুরাম। আমার কাঁধে এই যে কুঠারটা দেখছ, গুরুদেবের আশীর্বাদে এই কুঠোর দিয়েই আমি একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে এসেছি গুরুদেবকে প্রণাম জানাতে। উনি আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। যখনই যাই না কেন, কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হবেন না। বেশ গম্ভীর ভাবে পরশুরাম আত্মপরিচয়টা দিয়ে দিলেন গণেশকে।

ঠিকই তাই। ঋষি জমদগ্নির ছেলে পরশুরাম প্রথমে হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনকে খতম করেছিলেন তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য। বাবাকে অপমান করে তাঁর কামধেনু জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অর্জুন। প্রথমে পরশুরাম তাই তাঁকে হত্যা করেছিলেন। তারপর থেকে ক্ষত্রিয়কুলের ওপর এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যত ক্ষত্রিয় ছিল,

একুশবার তাদের সবংশে নিধন করেছিলেন একাই গুরুদেব শঙ্করের আশীর্বাদে এই কুঠার নিয়ে। তাঁর কাছে তো গণেশ নাবালক।

পরশুরামের চোখে গণেশকে দেখতে নাবালক হলে কি হবে, একদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশরূপে মহাদেবের ছেলে, তার ওপর সব কটি গুণে অতুলনীয়। সেই মুহূর্তে বোধ হয় পরশুরাম তা বুঝতে পারেন নি।

—সবই বুঝলাম। তবুও, এখন তোমায় ভেতরে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। অপেক্ষা কর। উঠলে আমরা একসঙ্গেই যাব। গণেশের মনে তাঁর পরিচয় কোন দাগই কাটল না।

রাগে সারা শরীর চনমন করে উঠল পরশুরামের। মাথায় জ্বলে উঠল আগুন। কাঁধ থেকে ঝট্ করে কুঠারটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। হাতের মুঠোয় সেটা বাগিয়ে ধরে বললেন—আমি যাবই। দেখি তোমার কেমন সাধ্য আমাকে আটকাও।

তখনও শান্ত গণেশ। বললেন—কেন মিছামিছি মাথা গরম করছ পরশুরাম। এটা কি ঠিক হচ্ছে? তুমি ব্রাহ্মণ। আমরাও গুরুভাই! আমার ওপর রেগে গিয়ে তোমার ঐ অব্যর্থ কুঠার নিয়ে ছুটে আসা কি উচিত হচ্ছে? একটুও ধৈর্য ধরতে পারছ না?

কিন্তু তখন পরশুরামের মাথা এতই গরম যে, ভাল কথা শোনার মত মেজাজ কোথায়? তাঁর কুঠার হেনে গণেশকে তিনি খতম করবেনই। সুচন্দ্র, পুষ্করাক্ষ, কীর্তবীর্যদের মত দেববরে বলীয়ান ক্ষত্রিয়রা যাঁর কাছে কুটোর মত ভেসে গেল, সেখানে এই হাতিমুখো, পেটমোটা গণেশ!

কুঠার প্রায় ছোঁড়েন পরশুরাম, গণেশ বলে ওঠেন—পরশুরাম, এখনও বলছি শান্ত হও। তুমিও ক্ষত্রিয় নও, আমিও ক্ষত্রিয় নই। মহাদেবের ছেলে আমি, তোমার গুরুভাই! একুশবার তুমি ক্ষত্রিয় নিধন করেছ বলে ভেবো না যে, তোমার মত বীর আর কেউ নেই। ব্রাহ্মণ আমরা। আমাদের কি অত রাগ শোভা পায়?

গণেশের কথা শুনে বিকট হাসি হেসে পরশুরাম সজোরো কুঠার ছুঁড়লেন গণেশকে লক্ষ্য করে। কোন রকমে গণেশ তাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন—নিষেধ করলাম, তবু তুমি আমার কথা শুনলে না। তবে দেখ।

বলেই তাঁর গোটানো শুঁড়টা দিলেন খুলে। দেখতে দেখতে শুঁড় নিল বিশাল আকার। যেমন মোটা, তেমন লম্বা।

সেই শুঁড় দিয়ে গণেশ ঝপ্ করে পরশুরামের কোমর জড়িয়ে ধরে সটানে তুলে ফেললেন শূন্যে। হঠাৎ যে এমন ভাবে আক্রান্ত হতে পারেন, পরশুরাম তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ভয়ে তাঁর চুল খাড়া হয়ে গেল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে গেল। রেহাই পাবার জন্য শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করলেন।

শক্ত করে শুঁড় জড়িয়ে গণেশ ইতিমধ্যে তাঁকে চরকি ঘোরানোর মত ঘোরাতে শুরু করলেন চারদিকে। সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর ঘুরিয়ে আনে তাঁকে গণেশের শুঁড়। ঘুরিয়ে আনল গোলোকে। ভয়ে অবশ পরশুরাম, খেলার পুতুলের মত চারদিক ঘুরতে ঘুরতে সোজা এসে পড়লেন সমুদ্রের জলে। শুঁড়ে ধরে গণেশ আচ্ছা করে তাঁকে চোবালেন সমুদ্রের জলে। নাক-মুখ দিয়ে তাঁর পেটে ঢুকে গেল এক গাদা নোনা জল। তারপর একসময় আবার দুম্ করে সামনে আছড়ে নামিয়ে দিয়ে গণেশ গুটিয়ে নিলেন নিজের শুঁড়।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাটিতে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ মরার মত পড়ে রইল ভার্গব-নন্দন। তারপর আবার জ্বলে উঠল মাথায় আগুন। একুশবার যিনি পৃথিবীকে করেছেন ক্ষত্রিয়শূন্য, সামান্য এই নাবালক গণেশের হাতে এমন অপমান!

ক্রোধে অধীর হয়ে গুরুদেব শিবের কাছ থেকে পাওয়া পাশুপত অস্ত্র তুলে নিলেন তিনি গণেশকে মারবার জন্য। যেমন মারাত্মক, তেমনি ভীষণ এই অস্ত্র পাশুপত। শিব এই একটিমাত্র অস্ত্র দিয়েই অমর ত্রিপুরাসুরকে বধ করতে পেরেছিলেন। যেখানে গিয়ে পড়বে এই অস্ত্র, সেখানটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

পরশুরামকে পাশুপত তুলতে দেখে এতক্ষণে কার্তিক এলেন একটু এগিয়ে। এতক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন। এবার বাধা দিয়ে উঠলেন তিনি—ও কি করছ পরশুরাম। থামো....থামো। ও অস্ত্র ছুঁড়োনা। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা! ক্রোধে পরশুরাম ছুঁড়লেন পাশুপত বাণ।

বাবার অমোঘ অস্ত্র পরশুরামের হাত থেকে ছুটে আসতে দেখে নিরুপায় হয়ে গণেশ তার বাঁ দাঁত দিয়ে আটকালেন তাকে। বীর গজানন ইচ্ছে করলেই পাশুপতকে সহজেই কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা করলে যে বাবার অপমান করা হবে। তাই বিনা প্রতিবাদেই তিনি মেনে নিলেন আঘাত। ফলে মুখ থেকে তাঁর বাঁ দাঁতটা সমূলে কেটে গেল। অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আর গোটা কৈলাস কাঁপিয়ে সেই দাঁত সশব্দে পড়ে হয়ে গেল একটি স্ফটিক পাহাড়।

একদিকে পাশুপতের গর্জন,গণেশের আর্তনাদ, কার্তিকের হাহাকার, আর একদিকে সশব্দে গজদন্তের পতন—কেঁপে উঠল ত্রিলোক, যেন প্রলয় কাণ্ড হয়ে গেল। ভয়ে দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিন্নর, মুনি-ঋষি যে যেখানে ছিলেন ছুটে আসতে শুরু করলেন কৈলাসের দিকে। ঘুম ভেঙে গেল শিব-পার্বতীর। ধড়মড় করে-দুজনেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

এসে গণেশকে ঐ অবস্থায় দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন পার্বতী।

অজ্ঞান-অচৈতন্য ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বারবার দেখলেন। দেখলেন মহাদেবও। দেখেও তিনি কিন্তু চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পার্বতী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না। আহা! অতি কষ্টে পাওয়া তাঁর ঐ ছেলে। একে তো গজানন, তার ওপর আবার এই আঘাত— এ কি কোন মা সহ্য করতে পারেন?

—কে? কে আমার ছেলের এমন দশা করল? কাঁদতে কাঁদতে আকুলি-বিকুলি করেন পার্বতী-কার্তিক। কার্তিক! চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? বল...বল! তুমি থাকতে কে আমার গণেশের এমন দশা করল?

মা যখন জানতে চাইছেন, কার্তিক কি আর চুপ করে থাকতে পারেন? আদ্যোপান্ত সবই শোনালেন মা-কে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে কটমট করে পার্বতী তাকালেন পরশুরামের দিকে।

কোল থেকে গণেশের মাথাটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি পরশুরামের সামনে। বললেন—পরশুরাম, গণেশ না তোমার গুরুভাই, এই তোমার গুরুদক্ষিণা? মহাদেবের অনুগ্রহে তুমি একুশবার ক্ষত্রিয়দের নিধন করেছ বলে তোমার এত অহঙ্কার, এত দম্ভ হয়ে গেল, যে ভেবে নিলে.

তোমার মত বীর আর ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই? জান, তোমার মত হাজার গণ্ডা পরশুরামকে ও এক নিমেষে রসাতলে পাঠাতে পারে? শুধু আমাদের ছেলে, আর সংযমী বলে কিছু করেনি। তুমি...তুমি, সেই সুযোগে তাকে এত বড় আঘাত হানলে!

বলতে বলতে পার্বতীর চেহারাই যেন বদলে যেতে লাগল। লাল হয়ে উঠতে লাগল মুখ। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হতে লাগল। দেখে তো পরশুরামের শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। এখন বুঝতে পারছেন তিনি রাগের মাথায় কি অন্যায়টাই না করে ফেলেছেন! গুরুদেব চুপ করে দাঁড়িয়ে। গুরু-মা জ্বলে যেন আগুন।

—প্রতিদান যখন এভাবেই দিলি তুই পরশুরাম, এখন তোকেও এর ফল ভোগ করতে হবে। বলেই পার্বতী উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে ঘর থেকে নিয়ে এলেন ভীমকায় এক ত্রিশূল—আজ এই ক্রিশূলেই তোকে এফোঁড়-ওফোঁড় করব। তোর মত কুলাঙ্গার শিষ্য আমাদের থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।

পরিত্রাণের আর কোন উপায় নেই দেখে পরশুরাম এক মনে ডাকতে লাগলেন শ্রী-হরিকে—স্বয়ং জননী শঙ্করী আসছেন ত্রিশূল হাতে আমাকে মারতে। ভগবান, এখন তুমি ছাড়া এ অভাগাকে আর কে আছে বাঁচাবার?

পরশুরামের অন্তরের ডাক শ্বেতদ্বীপে বসে নারায়ণ শুনতে পেয়েই উঠলেন বিমানে। পার্বতী ত্রিশূল হাতে মারতে যাবেন পরশুরামকে, এমন সময় ঝপ্ করে এসে তিনি নামলেন সেখানে। হঠাৎ নারায়ণকে দেখে সবাই থতমত খেয়ে গেলেন। এমন কি পার্বতীও।

হাসিমুখে নারায়ণ এসে সামনেই দাঁড়াতেই দেবতারা প্রণাম জানালেন। ত্রিশূল ফেলে পার্বতীও প্রণাম জানালেন তাঁকে।

শঙ্করীর ত্রিশূলের হাত থেকে বেঁচে গেলেন পরশুরাম। নারায়ণ গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন গণেশ।

তারপর পরশুরামকে একটু হালকা ধমক দিয়ে নারায়ণ বললেন—ছি...ছি রাম, এটা তোমার ভারি অন্যায়। গণেশ তোমার ভাই। তার ওপর এত রাগ কি ভাল? ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করা কি কখনো উচিত? যাও, মিলে-জুলে থাক গে।

আর পার্বতীকে বললেন—তুমি না মা? জগতের মা তুমি, রাম তো তোমারও ছেলে। ও অন্যায় করেছে ঠিকই, কিন্তু এবার তোমার ছেলের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ তো? আগের চেয়ে একটা দাঁতে এখন তোমার গণেশকে আরো ভাল দেখাচ্ছে না?

অস্বীকার করতে পারেন না পার্বতী। সত্যিই এখন আগের তুলনায় অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। মন থেকে রাগ চলে গেল পার্বতীর। আবার ঝরে পড়ল মাতৃস্নেহ।

এখন পরিস্থিতি দেখলে কে বলবে কিছুক্ষণ আগে কৈলাসে ঘটতে যাচ্ছিল এক তুলকালাম কাণ্ড।

কার্তিকের জন্মরহস্য

পার্বতীর প্রথম ছেলেটি কোথা দিয়ে যে কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল জন্ম-মুহূর্তে, তা কোন মতেই বুঝে উঠতে পারেন না দেবী পার্বতী। দেবাদিদেব শিবের ঘরনী তিনি। তাঁর আর সেই শিবের চোখকে ধুলো দিয়ে কে নিয়ে গেল? কোথায়ই বা গেল? কতবার যে একথা আকুল হয়ে শিব যোগীকে জিজ্ঞেস করেছেন পার্বতী, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোন উত্তরই তিনি পান নি। যদিও অনেক কষ্ট করে পরে গণেশকে পেয়েছিলেন, তিনি তবুও তার কথা ভুলতে পারেন নি পার্বতী।

গণেশ হওয়ার পরে পরেই যে সমস্ত কাণ্ড-কারখানা ঘটতে লাগল, তার জন্য বেশ কয়েকবার ভগবানকে কখনো বৈকুণ্ঠ থেকে কখনো-বা শ্বেতদ্বীপ থেকে ছুটে আসতে হয়েছিল ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মিটিয়ে দেবার জন্য।

সেই রকম ভাবেই একদিন ভগবান এসেছেন কৈলাসে। রাজ্যের দেব-দেবী, মুনি-ঋষি, গন্ধর্ব-কিন্নররা তখন সেখানে। মহাদেবের রত্নময় প্রাসাদে মশগুল।

সকলের মাঝেই হঠাৎ দুর্গা, দেবী জিজ্ঞেস করে বসলেন নারায়ণকে—আচ্ছা ভগবান, আপনার তো অজানা কিছুই নেই। বলুন না, আমার প্রথম ছেলেটি হতে না হতেই কোথায় গেল?

শুনে নারায়ণ প্রথমে মুখটা টিপে একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—সে কি কথা পার্বতী। তোমার প্রথম ছেলে উধাও? মানে, শিবের প্রথম ছেলে বেপাত্তা। তার মানে?

—সে মানে তো আপনিই জানেন ভগবান। শুধু এটুকু মনে আছে ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি—এরকম কয়েকজন দেবতা একবার উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলেন। ওদেরই কোন চক্রান্ত কিনা, তা আপনিই বলতে পারেন—বললেন পার্বতী।

—সে কি কথা! এতগুলো দেবতা থাকতে শিবপুত্র উধাও হয়ে যায়? সত্যিই পার্বতী, এ তো যা-তা ব্যাপার নয়। সন্ধান অবশ্যই নিতে হয়। নারায়ণ এমন ভাবে বললেন যেন তিনিও কিছুই জানেন না।

আসলে এই সব কিছুর মূলে কিন্তু ছিলেন তিনিই। বিয়ের পর পার্বতী যখন শিবের সঙ্গে ঘর করছিলেন মনের আনন্দে, তিনিই তখন দেবতাদের ডেকে বলেছিলেন—দেবগণ, শিবের প্রথম যে ছেলেটি হবে সে যদি পার্বতীর কোলে জন্মায়, আর তাঁর স্তনদুগ্ধ খায় তবে সে ছেলেকে বাগে আনা খুবই শক্ত হবে। সুতরাং খুব সাবধান।

নারায়ণের কথা শুনে দেবতারাও বেশ চিন্তায় পড়েছিলেন। নর্মদার তীরে বসে বহুক্ষণ ধরে আলোচনাও করেছিলেন। উপায়ও বের করেছিলেন। আবার ভয়ও ছিল, শিবের হাতে ধরা পড়ে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। ধরা অবশ্য পড়তে হয় নি। কাজও হাসিল হয়ে গিয়েছিল। আজ এতদিন পর আবার যে পার্বতী তাঁদের সকলের সামনে নারায়ণের কাছে এই প্রশ্ন রাখতে পারেন তা ভাবতেও পারেন নি কেউ।

নারায়ণ একবার তাকালেন গম্ভীর মুখে দেবতাদের দিকে। তখন যাঁরা যাঁরা সেখানে ছিলেন, ভয়ে সকলেরই বুক দুরু দুরু করে উঠল। এক দিকে নারায়ণ, আর একদিকে শিব। মানে একদিকে হরি, আর অন্যদিকে হর। দেবতারা তো জানেন, দু-জনে আলাদা হলেও দু-জনের মধ্যে হরিহর-আত্মার সম্পর্ক।

—দেবগণ, পার্বতীও যা বলল তা তো খুব লজ্জার কথা। তোমরা থাকতে শিবের ছেলের বেপাত্তা হল, এটা কি আমায় মেনে নিতে হবে? যদি কেউ কিছু জানো সত্যি করে বল। গোপন করার চেষ্টা কোরো না। বললেন নারায়ণ।

ইন্দ্র, রুদ্র, বরুণ, কুবের, অশ্বিনীকুমার দুই ভাই আর প্রধান প্রধান যে

সব দেবতারা সেখানে ছিলেন, সকলেই এক এক করে বলে উঠলেন, তাঁরা এর কিছুই জানে না। আজ গণেশের জন্মোৎসবে আনন্দ করতে এসেছেন তাঁরা। আগে যে একটা ছেলে হয়েছিল পার্বতীর,এই প্রথম শুনছেন। ছি...ছি....এ ঘোর অন্যায়। এ অন্যায় যে করেছে তাকে ফলভোগ করতেই হবে।

শুনে ভগবান বিষ্ণু এবার কাছে ডাকলেন সূর্য, ধর্ম, পৃথিবী, পবন আর চন্দ্রকে। কাছে ডেকে এনে সকলের অসাক্ষাতে একবার চোখ টিপে বললেন—কি গো, তোমরা কিছু জানো নাকি? যদি জানো তো খোলাখুলি বল বাপু'। তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কারো কিছু করার সাধ্য নেই। বলেই ভগবান বিষ্ণু এমনভাবে তাকালেন তাদের দিকে যে ভয়ে তাঁদের বুক দুরু-দুরু করে উঠল।

ধর্ম বললেন—না না, মিথ্যে কথা বলব কেন, আর গোপনই-বা করব কেন! আমি শুধু এটুকু জানি যে শিবের একটি সন্তান ভুমিষ্ঠ হয়েছিল তা মিথ্যে নয়। পার্বতী ঠিক কথাই বলেছেন।

—তাহলে পৃথিবী, সন্তান যখন তোমার কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, তখন সে কোথায় গেল, তা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়। বললেন নারায়ণ।

—ঠিক কথা ভগবান। বললেন দেবী পৃথিবী—অমন সন্তানকে ধরে রেখে যে মায়ের হাতে তুলে দেব, সে অবকাশ আমি পাইনি ভগবান। এমন দাপাদাপি শুরু করেছিল যে ভয়ে আমি তাকে তুলে দিয়েছিলাম অগ্নিদেবের হাতে।

অগ্নিদেব বললেন—তার তেজ আমি সহ্য করতে না পেরে ফেলে দিয়েছিলাম শরবনে।

পবনদেব বললেন—অগ্নিদেব ঠিকই বলেছেন, ভগবান। তখন আমি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ছিলাম, সব দেখেছি।

এরপর সূর্যদেব বললেন—মিথ্যে নয় ভগবান। আমি তখন অস্তাচলে যাচ্ছিলাম। শরবনের ভেতর একটা ফুটফুটে ছেলেকে কাঁদতে শুনে চেয়ে দেখলাম ছ-জন ধাইমা। ছ-জনই কৃত্তিকা। তাকে স্তন-দুধ খাইয়ে ভোলাচ্ছে। আমার মনে হয়, সেই শিশুটি এখন বোধ হয় কৃত্তিকাদের কাছেই আছে।

শুনতে শুনতে পার্বতীর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

সূর্যদেবের কাছ থেকে শেষ সংবাদটুকু পেয়েই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন পার্বতী। এতদিন পরে তাহলে সন্ধান মিলেছে? আহা, কত বড় হয়েছে, কেমন আছে? দেখার জন্য ছটফট করে ওঠে তাঁর মন। তাকান তিনি শিবের দিকে।

তারপর মহাদেবকে শুনিয়েই বলে ওঠেন—আমার ছেলে থাকবে কৃত্তিকাদের কাছে? না না। তা হতে পারে না। আমি এখুনি আনাব।

বলেই ডাকলেন নন্দীকে। বললেন—নন্দী তুমি এখনই কৃত্তিকাদের কাছে গিয়ে আমার ছেলেকে এনে দাও।

মায়ের হুকুম। সঙ্গে সঙ্গে নন্দী ছুটল কৃত্তিকাদের কাছে। তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখে, সাদা-মাটা ঘর, উঠোন। আর উঠোনে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি ছেলে। কিশোর বটে। দারুণ স্বাস্থ্য। কিন্তু ছটি মুখ।

নন্দী কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করল—ছেলে, তুমি এখানে কেন?

চেনেও না ছেলেটি নন্দীকে। হঠাৎ তাকে দেখে আর ঐরকম প্রশ্ন শুনে ছেলে তাকাল তার দিকে। বলল-তার মানে? আমি কৃত্তিকাদের ছেলে কার্তিক। আমার ছয় মায়ের স্তনদুধ আমি একসঙ্গে খাই, তাই আমি ষড়ানন। আমি আমার মায়েদের কাছে থাকব না তো, কোথায় থাকব? কিন্তু আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

নন্দী বলল—আমি মহাদেবের অনুচর নন্দী। পার্বতী আমার মা। আসছি কৈলাষ থেকে। মায়ের আদেশে তোমাকে এখান থেকে কৈলাসে নিয়ে যেতে এলাম।

—কেন? কৈলাসে কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কার্তিক।

—বারে? এটা কি তোমার বাড়ি নাকি? এ বাড়িতে কি তোমার থাকা মানায়? তুমি হলে দেবাদিদেব মহাদেবের ছেলে। আমাদের মা পার্বতী হলেন তোমার মা।

নন্দীর কথা শুনে কার্তিক তো অবাক। কেই-বা মহাদেব? আর কেই-বা পার্বতী? জ্ঞান হয়ে অবধি সে দেখেছে তার এই ছয় মাকে।

এরপর নন্দী সবই খুলে বলল কার্তিককে। ইতিমধ্যে ছয় কৃত্তিকাও

এসে হাজির হয়েছে সেখানে। শুনল তারাও। বলল-কার্তিক, উনি ঠিকই বলেছেন। ব্রহ্মার আদেশে আমরাই তোমাকে শরবন থেকে তুলে এনে বড় করেছি, বাবা। এখন তোমার মা তোমাকে নিতে পাঠিয়েছেন। তোমার বাবা নিশ্চয়ই তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। দেরি কোরো না বাবা। তোমার বাড়িতে তুমি ফিরে যাও।

নিজের পরিচয় পেয়েও প্রথমে কার্তিকের খুবই কষ্ট হল কৃত্তিকাদের ছেড়ে যেতে। তবুও নন্দীর সঙ্গে কার্তিক দিব্য বিমানে চেপে কৈলাসে গেল।

শিবপুত্র কার্তিক আসছেন। একে তো গণেশের জন্মোৎসবের ধুমধাম। তার ওপর আবার এতদিন পর আসছে হারানো ছেলে কার্তিক। কৈলাস যেন আনন্দে ফেটে পড়তে লাগল।

আকাশ থেকে কার্তিককে নিয়ে বিমান এসে নামতেই পার্বতী তাকে বুকে জুড়িয়ে নিলেন। নবীন কিশোর। হাতে ধনুক—বাণ। পাশে দাঁড়িয়ে শিব। একে একে মা-বাবাকে প্রণাম করে প্রাসাদে ঢুকেই দেখেন রত্ন-সিংহাসন আলো করে বসে স্বয়ং বিষ্ণু। তাঁকেও প্রণাম জানাল কার্তিক। প্রণাম জানাল এক এক করে সব দেবতাদের। প্রত্যেকেই প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন তাকে। গণেশও বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর ভাইকে।

আনন্দের বন্যা বইতে লাগল কৈলাসে।

দুর্বাসার দুর্বিপাক

অত্রি মুনির ছেলে দুর্বাসা। সতী-সাধ্বী অনসূয়ার মহা তপস্যার বলে দেবাদিদেব শঙ্কর তাঁদের ছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন দুর্বাসা নামে।

মহা তপস্বী, মহাযোগী দুর্বাসা। তাঁর সবই ভাল। শুধু একটা কারণে সকলেই তাঁকে ভয় করে চলতেন, সেটা হল তাঁর রাগ। একবার রেগে গেলে তাঁর আর কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত না। মুখে যা আসত,তাই বলে অভিশাপ দিয়ে বসতেন। মহাযোগীর মুখের কোন কথা বিফল হবার নয়। অবশ্যই ফলে যেত। তাঁর এই ক্রোধের জন্য আর সামান্য কারণে যাকে-তাকে শাপ-শাপান্ত করার জন্য অত্রি মুনি অনসূয়ার মনেও কষ্ট কিছু কম হত না। কিন্তু কি আর শাসন করবেন ছেলেকে। ছেলে তো আর অবুঝ নয়।

গন্ধমাদন পর্বতের এক গুহায় যুবক দুর্বাসা একবার এক মনে ধ্যানে বসেছিলেন। কেউ তা জানতও না।

দৈত্যরাজ বলির ছেলে সাহসিক আর অপ্সরা তিলোত্তমা সেখানে মনের আনন্দে এমনভাবে হই-হুল্লোড় আর বিহার করে বেড়াচ্ছিল যে, কোন দিকেই আর তাদের চোখ-কান ছিল না। তাদের হুল্লোড়ে কয়েকবার ধ্যান ভেঙে গেল দুর্বাসার। শেষে নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে গুহা থেকে বেরিয়েই ওদের দেখতে পেলেন।

তখন রাগে তাঁর চোখের তারা বনবন করে ঘুরছে।

সাহসিককে বললেন—বলির ছেলে হয়ে তুই এমন নির্লজ্জ, বেহায়া যে একটা অপ্সরার সঙ্গে পাহাড় কাঁপিয়ে হই-হুল্লোড় করছিস? ও-কাজ তো গাধারা করে। যা, তুই অসুরকূলে গর্দভ হয়ে জন্মাগে।

তারপর তিলোত্তমাকে বললেন—অপ্সরা হয়ে ভেবেছ যা খুশি তাই করে বেড়াবে? স্বর্গ জয় করে নিয়েছ নাকি? যাও, তুমিও অসুরকুলে গিয়ে জন্মাও গে। দুর্বাসাকে হঠাৎ ওখানে গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এমনিতেই দু-জনে যথেষ্ট ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তার ওপর এই অভিশাপ! দু জনেই এসে লুটিয়ে পড়ল মুনির পায়ে—অপরাধ হয়ে গেছে আমাদের। ক্ষমা করুন।

মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়ে গেছে, আর কি তা ফেরে। হাতের ঢেলা কাউকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে তা কি আর হাতে ফিরে আসে? মাথা তার ফাটবেই। সাহসিক তিলোত্তমারও এখন সেই অবস্থা।

অনেক অনুরোধ-উপরোধ করল দু জনে।

দুর্বাসা বললেন—এখন আমার আর কিছু করার নেই। তবে একটা কথা বলতে পারি। গর্দভ হয়ে জন্মালেও, সাহসিক, তোমাদের বংশটাই হরিভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন।

—মুনিবর, স্বর্গের অপ্সরা আমি। স্বর্গসুখ ছেড়ে আমাকে কতদিন এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। দয়া করে বলুন আমি কিভাবে মুক্তি পাব। দুর্বাসার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তিলোত্তমা কাঁদে আর বলে।

দুর্বাসা বললেন—শোন, তুমি গিয়ে জন্মাবে বাণাসুরের ঘরে তার মেয়ে হয়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ যেদিন তোমাকে বিয়ে করবে, সেদিন তোমার শাপমুক্তি হবে। যাও, এখান আর বিরক্ত কোরো না।

চলে গেল ওরা দু জনেই। দুর্বাসার কথামত ভবিষ্যতে অবশ্যই তাই হয়েছিল। গর্দভাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রাণ দিয়ে উদ্ধার পেল। আর বাণরাজার মেয়ে উষা হয়ে তিলোত্তমাকেও উদ্ধার করেছিল শ্রীকৃষ্ণের নাতি অনিরুদ্ধ।

ব্যাপারটা ওখানেই মিটে যেতে পারত। কিন্তু মিটল না।

চঞ্চল হয়ে উঠল দুর্বাসার মন। ধ্যানে তপস্যায় আর কিছুতেই মন বসাতে পারেন না তিনি। মনের কোণে খালি ভেসে ওঠে নারী মূর্তি। প্রবল বাসনা জাগে বিয়ে করার। কিন্তু তাঁর মত সংসার-অনভিজ্ঞ মুনিকে কে দেবে মেয়ে?

—এমন সময় মহাতপা ঔর্ব্ব ঋষি এলেন তাঁর কাছে, মেয়ে কন্দলীকে নিয়ে। অপরূপা কন্দলী। রূপে যেন লক্ষ্মী। একমাথা ঘন কালো চুল, টানা টানা চোখ। মেয়েটিকে দেখে দুর্বাসার মনে হয়েছিল যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে এইরকম একটি মেয়ে হলেই ভাল হয়।

যাই হোক ঔর্ব্ব ঋষি তাঁর কাছে। সম্ভাষণ জানিয়ে দুর্বাসা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন।

ঔর্ব্ব ঋষি বললেন—আমার এই মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। এর নাম কন্দলী।

—আপনার মেয়ে? জিজ্ঞেস করেন দুর্বাসা—আমি বিয়ে করব? আপনি কি বলছেন? বিয়ে করে যদি সংসারই করব, তবে এভাবে তপস্যা করে বেড়াব কেন? মনের ভাবটা এই মুহূর্তে গোপন করলেন দুর্বাসা।

ঔর্ব্ব ঋষি বললেন—দেখ দুর্বাসা, তুমি তো জান, আমি নিজে কোন সংসারধর্ম করি নি। অথচ আমারই জানু থেকে জন্ম নিল এই মেয়ে। তাই মেয়ে আমার অযোনিসম্ভবা। একদিকে বাবা আর একদিকে মা-দুটো ভালবাসা দিয়ে ওকে আমি এত বড় করে তুলেছি। প্রথম মেয়ে আমার, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে গোঁ ধরে বসেছে। তাই কি আর করি, অনেক খুঁজতে খুঁজতে তোমার সন্ধান পেলাম এখানে। তোমাকে যে আমার দায় উদ্ধার করতেই হবে, দুর্বাসা।

সব শুনে দুর্বাসা তবুও 'কিন্তু...কিন্তু' করতে লাগলেন দেখে মহাতপা ঔর্ব্ব বললেন—শোন দুর্বাসা, আমার মেয়ের গুণের তুলনা নেই। আমি ওকে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান সব দিক থেকে তৈরি করেছি। শুধু দোষের মধ্যে একটা, তাহল, হঠাৎ হঠাৎ রেগে গিয়ে মুখে যা আসে, তাই বলে বসে। ওর এই দোষটা আমি কিছুতেই শোধরাতে পারি নি।

মনে মনে তো রাজি হয়ে গিয়েছিলেন দুর্বাসা।

তবুও এবার মুখ ফুটে সম্মতি জানালেন। বললেন—আপনার মেয়ের একান্ত ইচ্ছে আর আপনার অনুরোধ ঠেলি কেমন করে। তবে একটা কথা ঋষিবর,ঐ কটু-কাটব্য আমি বড় একটা সহ্য করতে পারি না। বিয়ে আমি করছি বটে, কিন্তু ওর একশটা কটু কথা আমি সহ্য করব। তারপর কিন্তু আর নয়।

যাই হোক, কন্দলীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল দুর্বাসার। ঔর্ব্ব ঋষিও বিয়ে দিয়ে দুর্বাসার কাছে মেয়েকে রেখে চলে গেলেন আবার সরস্বতী নদীর তীরে, তাঁর আশ্রমে তপস্যা করতে।

এদিকে রূপসী বউ পেয়ে দুর্বাসাও শুরু করে দিলেন রীতিমত ঘর সংসার। আর এমনি মজে গেলেন যে, জপ-তপ, ধ্যান-ধারণা সব উঠল মাথায়। জপ করতে বসবেন কি, স্ত্রী কন্দলী দাঁড়িয়ে সামনে। সব সময়ই একটা চিন্তা পেয়ে বসল দুর্বাসাকে, কি করলে বউ তার খুশি হবে, সুখে থাকবে।

এভাবে যত দিন যেতে লাগল, দুর্বাসাও পুরনো হতে লাগলেন কন্দলীর কাছে। ততই আস্তে আস্তে ফুটে বেরতে লাগল কন্দলীর দুর্মুখ স্বভাব। কারণে-অকারণে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠতে শুরু করল। শুনে মাথা গরম হয়ে ওঠে দুর্বাসার। তবুও কোন রকমে সামলে নেন নিজেকে। যাঁর মুখের ওপর কেউ কথা বলার সাহস পায় না, সামান্য একটা মেয়ে, তাঁকে এভাবে যা নয় তাই বলতে শুরু করল! আর তাঁকে কিনা তা হজম করে চলতে হচ্ছে? মনে মনে ভাবেন দুর্বাসা, হায় রে, বিয়ে করে এ কি দুর্বিপাক! তবুও উপায় নেই। শ্বশুরকে কথা দিয়েছেন,একশটা কটু-কাটব্য তাঁকে সহ্য করতেই হবে। তাই শুধু গুণে রাখেন, কটা হল কন্দলীর কুকথা।

দেখতে দেখতে একদিন পূর্ণ হল কন্দলীর একশটা কটু কথা। প্রতিজ্ঞার শেষ দিন। শাপ দিতে গিয়েও দুর্বাসা দিতে পারলেন না। ভাবলেন, এবারটাও ক্ষমা করে দিই। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভাবেন—বিয়ে করে তো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লেন তিনি। কোন অসুবিধেই তিনি রাখেন নি তাঁর স্ত্রীর। অথচ এ কি দুর্ব্যবহার! মেয়েমানুষের এ কি রাগ! আর পুরুষ হয়েও যেহেতু বিয়ে করেছেন হজম করে যেতে হচ্ছে! এ কি জ্বালায় পড়লেন তিনি—যে বোঝালেও বোঝে না।

তবুও একদিন আর সহ্য করতে পারলেন না। আগুনের মত জ্বলে উঠলেন দুর্বাসা।

—কি! এত বড় স্পর্ধা তোমার,যে পূজনীয় স্বামীকে কটু কথা বল? কিসের এত ক্রোধ? কেন এত কটুকথা! দিন-দিন যে আগুন তুমি জ্বেলেছ, তাতেই তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাও।

যোগীরাজ দুর্বাসার অভিশাপ। বৃথা যাবার নয়। সঙ্গে সঙ্গে অমন সুন্দর কন্দলী পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

যে মুহূর্তে কন্দলী পুড়ে ছাই হয়ে গেল, অমনি দুর্বাসার মনে জাগল

অনুতাপ। মানুষ হয়ে জন্মালে রাগ-ক্ষোভ-দুঃখ,এসব তো থাকবেই। নিজে অত বড় যোগী হয়েও যখন রাগ সামলাতে পারেন না, তখন মেয়েমানুষ কন্দলী তো কোন ছার! শেষে রাগের বশে নিজেই নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেললেন? নারীঘাতী হলেন! ছি....ছি..., এতদিন জপতপ করে শেষে তাঁর এই হাল? এ জীবন না রাখাই ভাল।

মনের দুঃখে এরকম সাত-পাঁচ ভেবে দুর্বাসা আত্মহত্যা করতে যাবেন, দেখলেন কোথা থেকে হঠাৎ তাঁর সামনে এসে দাড়ালেন অপূর্ব সুন্দর এক ব্রাহ্মণ যুবক। চাঁদের মত মুখ, কপালে তিলক, পরনে লাল কাপড়, হাতে ছাতা-লাঠি। দেখলেই ভক্তি আসে। নতজানু হয়ে প্রণাম জানাতে ইচ্ছে হয়। দেখে দুর্বাসা প্রণাম করলেন।

ব্রাহ্মণ যুবক বললেন—এ কি করতে যাচ্ছ মুনি? তুমি না জ্ঞানী, যোগী? সব ছেড়ে ছুড়ে শেষে মায়ায় পড়ে হাবুডুবু খেতে যাচ্ছ? ওসব বুদ্ধি ছাড়। যাঁর ধ্যান করেছিলে সেই ভগবান শ্রীহরির ধ্যান কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুবকের কথায় যেন চৈতন্য ফিরে এল দুর্বাসার। এত অল্প বয়স, অথচ এমন কথা মুখে। কে এই ব্রাহ্মণ যুবক? মুখ তুলে তাকিয়ে দেখেন মুনি, কোথায় কে? হাজার হোক দুর্বাসা যোগী। বুঝতে অসুবিধে হল না যে শ্রীহরি নিজেই তাঁকে ছলনা করে গেলেন। মনকে ঠিক করে নিয়ে দুর্বাসা আবার আগের মতই মজে গেলেন ধ্যানে।

ইতিমধ্যে মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঔর্ব্ব ঋষি সরস্বতী নদীর আশ্রম থেকে ছুটে এলেন। শ্বশুরকে প্রণাম জানিয়ে সব বললেন দুর্বাসা। শুনে ঔর্ব্ব বললেন—মেয়ে আমার এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছিল দুর্বাসা যে তুমি তাকে মেরে ফেললে? একজন যোগী হয়ে তোমার রাগও তো কিছু কম নয়!

শুধু মুখ বুজে শুনলেন দুর্বাসা। সত্যিই তো, এর কোন জবাবই নেই।

যাবার সময় ঔর্ব্ব ঋষি শুধু বলে গেলেন—এর সাজা আমি আজ তোমায় দেবো না। সাজা আর শিক্ষা তুমি ঠিক সময়েই পাবে।

[সত্যিই দুর্বাসা তা পেয়েছিলেন রাজা অম্বরীষের কাছ থেকে। আর কিভাবে পেয়েছিলেন তা 'ভাগবত পুরাণ'-এর 'দুর্বাসার দর্পনাশ' পড়লেই জানতে পারা যায়]।

ব্রহ্মার দর্পনাশ

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বচরাচরে। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হলেন এক একজন ব্রহ্মা। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি এই সব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করছেন বিধাতাদের, সেইসব ব্রহ্মাণ্ডকে পাহাড়, নদী, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ দিয়ে ভরিয়ে তোলার জন্য। তাঁর ইচ্ছায় এ সব ব্রহ্মারা নানা ভাবে পৃথিবীতে প্রজা সৃষ্টি করছেন। আবার তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে প্রলয়, ধ্বংস। আবার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার সব ব্রহ্মা যে দেখতে একরকম তা নয়। কেউ হলেন চতুর্মুখ, কেউ-বা দশানন, কেউ-বা আবার শতমুখ-হাজার মুখ ব্রহ্মাও আছেন।

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হলেন চতুর্মুখ। বেদের স্রষ্টা। বেদ হল সুবিশাল জ্ঞানসমুদ্র—যা পড়লে সব কিছুই জানা যায়। কিছুই আর অজানা থাকে না।

আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মার মনে মনে একবার খুব অহঙ্কার হয়েছিল। যদিও বিষ্ণু আর মহেশ্বর নামে আরও দু জনে আছেন দু রকমের কাজে, কিন্তু ব্রহ্মার ধারণা হয়েছিল, তিনি নিজে যদি কিছু না করেন, তাহলে এঁরা তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। তিনিই সকলের পূজনীয়। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। পদে পদে ব্রহ্মা চলতেন কতটা এরকম মেজাজ নিয়েই।

ভগবান শ্রীহরির তো আর কিছু অজানা থাকার কথা নয়। তিনি সবই জানতেন, বুঝতেও পারতেন। আর নিজের মনেই বলতেন, 'হায় রে।'

বহুকাল আগের কথা।

সুচন্দ্র তখন পৃথিবীর রাজা। অসাধারণ হরিভক্ত।

বেশ কিছুকাল রাজকাজ করার পর সব ছেড়ে রাজা চলে গেলেন মলয় পাহাড়ে শ্রীহরির তপস্যা করতে।

একমনে সেই তপস্যায় রাজার কেটে গেল হাজারটা বছর। খাদ্যের মধ্যে কেবল বায়ু। উইপোকা একটু একটু করে তাঁর শরীরের মাংস খেতে খেতে সবটাই খেয়ে মাটি করে ফেলল। আর সেই মাটিতে ঢাকা পড়ে রইল শুধু হাড় কখানা। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না রাজার। উইঢিবির ভেতরে শুধু দুটো চোখ ছাড়া আর এমন কিছু ছিল না, যে দেখলে ওখানে কোন মানুষ আছে বলে কেউ মনে করবে।

রাজার সেই কঠোর তপস্যা দেখে বিধাতা ব্রহ্মার টনক নড়ল।

সময় করে হঠাৎ একদিন তিনি এসে হাজির হলেন সেখানে। কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন সেই ঢিবির ওপর। দিতেই কোথায় চলে গেল উই-এর ঢিবি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই আগের চেহারা।

সামনে ব্রহ্মাকে দেখে প্রণাম জানালেন রাজা।

ব্রহ্মা বললেন—বল, কিসের জন্য তুমি এত কঠোর তপস্যা করছ? কি তোমার অভিলাষ? আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।

রাজা বললেন—পিতামহ, আমার শুধু একটাই বাসনা। শ্রীহরির পায়ে যেন আমার মতি থাকে। আমি যেন সব সময়ের জন্য তাঁর দাস হয়ে থাকতে পারি।

—এই মাত্র! বললেন ব্রহ্মা—বেশ, তাই হবে, তুমি তাঁর দাস হয়েই থাকতে পাবে।

বর দিয়ে ব্রহ্মা যেই পেছন ফিরেছেন, রাজা দেখলেন আকাশপথ ধরে নেমে আসছে দিব্য এক বিমান। ফুলে ফুলে সাজানো। বিমানে কয়েক জন আরোহী। তাঁদের প্রত্যেকেরই গায়ে চন্দন মাখা, মাথায় মুকুট, পরনে পীতবাস, কানে কুণ্ডল।

বিমান এসে নামল তাঁর সামনে। তারপর সমাদরে সেই আরোহীরা তাঁকে সেই বিমানে তুলে নিয়ে চলে গেলেন গোলকে।

সুমেরুতে নিজের থাকবার জায়গায় আপন মনে ফিরে চলেছেন ব্রহ্মা।

গলায় অক্ষমালা। হাতে কমণ্ডলু। কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর।

পথের মাঝে এক ফুলের বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মানিনী নামে এক অপ্সরা। হঠাৎ ব্রহ্মাকে দেখেই তার বেড়ানো গেল ঘুচে। ঠিক করে ফেলল, যেভাবেই হোক ব্রহ্মার মন জয় করতে হবে।

যথেষ্ট বয়স হয়েছে ব্রহ্মার। চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। তবুও স্বাস্থ্য ছিল যেমন অটুট, তেমনি সুদর্শন। থাকতেনও তিনি খুব সংযমের মধ্যে। তার তুলনায় মানিনী এত ছোট, যে ব্রহ্মার নাতনিও বুঝি তার চেয়ে বড় হবে। তবু মানিনী পিছু নিল তাঁর।

ব্রহ্মা যেন দেখেও দেখলেন না, এমনি ভাবে তাকে উপেক্ষা করেই চলে গেলেন।

দেখে মানিনীরও মনে জেদ চেপে গেল। অপ্সরাদের উপেক্ষা কোন দেবতাই করতে পারেন না। কিন্তু, ব্রহ্মা তা করে গেলেন দেখে, মানিনীর দুঃখ হয়েছিল খুব। এখন চিন্তায় পড়ল মানিনী, কি ভাবে কাজ উদ্ধার করা যায়।

এমন সময় আর এক অপ্সরা রম্ভা এসে হাজির হল সেখানে। শুকনো মুখে মানিনীকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে যখন সব জানল, তখন বলল—একটা বুদ্ধি তোমায় দিতে পারি মানিনী। সেভাবে চেষ্টা করলে, আমার বিশ্বাস তোমার আশা অবশ্যই মিটবে।

—কি? জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল মানিনী।

—কামদেবকে সঙ্গে নিয়ে যাও না। দেখি, ব্রহ্মা কেমন ভাবে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন? বলল রম্ভা।

—বাঃ, বেশ চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছ তো বোন! বলেই মানিনী একমনে ভাবতে লাগল কামদেবকে।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কামদেবের অসাধ্য বলে কিছুই নেই। অমন যে যোগীরাজ মহাদেব, তাঁরও মন টলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আর ব্রহ্মা!

মানিনীর ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে কামদেব এসে হাজির হলেন সেখানে।

ব্রহ্মার তপোবন-এর চেহারাটাই হঠাৎ যেন পালটে গেল। গাছে গাছে এল নতুন কচি কচি সবুজ পাতা। ফুলের বাগান জুড়ে কত রকমের ফুল উঠল ফুটে, গাছের ডালে ডালে ডাকতে শুরু করল কোকিল, দক্ষিণ দিকে ফুরফুরে বাতাস। যেন অসময়ে এসে গেল বসন্তকাল।

বসন্তকালে নিজের মনকে বশে রাখা দারুণ শক্ত। অমন যে যোগী ব্রহ্মা, সব সময় যিনি থাকেন ধ্যান-জপের মধ্যে, তাঁরও মন উঠল চনমন করে। কোন মতেই আর মন বসাতে পারেন না। কেন এমন হল? চোখ খুলতেই দেখেন, সামনে কামদেব, সঙ্গে সেই মানিনী।

ব্রহ্মাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেই কামদেব লুকিয়ে পড়ল আড়ালে, আর অপ্সরা মানিনী পায়ে নূপুরের আওয়াজ তুলে প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে এল ব্রহ্মার কাছে।

মনে মনে প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন ব্রহ্মা। সর্বনাশ! এই জগতের স্রষ্টা তিনি। তিনিই বিধাতা হয়ে সকলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। আবার এই বুড়ো বয়সে তাঁরই ভাগ্যে এ কি বিপর্যয় এল। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখনও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে?

মন চঞ্চল হয়ে উঠলেও ব্রহ্মা কিন্তু ঠিকই করে নিয়েছিলেন কামদেব চালাকি করে যে ফাঁদ পেতেছেন তাতে তিনি কোন মতেই পা দেবেন না। এদিকে মানিনীরও এক জেদ, বিধাতা ব্রহ্মার মন জয় করতেই হবে।

কত ভাবে বোঝাল ব্রহ্মা মানিনীকে—বয়স হয়েছে আমার। আমার না আছে ধনসম্পদ, না আছে ঐশ্বর্য। সারাটা জীবন কাটালাম ধ্যান যোগ করে। সকলে আমায় কত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট তুমি। এই বয়সে কি তোমাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সাজে? কেন মিছামিছি আমায় এভাবে বিব্রত করছ বল তো।

তবুও মানিনীর সেই এক কথা—ব্রহ্মার ঘরনী সে হবেই।

ব্রহ্মার খুব রাগ হল কামদেবের ওপর। তারই জন্য যত ঝামেলা। কামদেবকে অভিশাপ দিয়ে ব্রহ্মা এবার গুম হয়ে বসলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন শ্রীহরিকে। আর মানিনীও সামনে বসে অনুনয়-বিনয় করে চলল।

এমন সময় কোথা থেকে পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অত্রি, কণ্ব, সনক, সনন্দ সব ব্রহ্মতেজী মুনিরা এসে হাজির হলেন ব্রহ্মার কাছে। তাঁদের দেখেই মানিনী গেল কুঁচকে। তাড়াতাড়ি ব্রহ্মার কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল একপাশে।

সকলকে দেখে ব্রহ্মা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রণাম সেরে মুনিরা জিজ্ঞেস করলেন ব্রহ্মাকে—এই মেয়েটি কে? এখানে কেন?

হাসতে হাসতে ব্রহ্মা বললেন—আমার মেয়ে।

সর্বজ্ঞ সব মুনি। ব্রহ্মা যাই বলুন, তাঁদের কিন্তু জানতে বাকি রইল না মেয়েটি কে? ব্রহ্মার কথা শুনে সকলেই তাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

আর যায় কোথা। রাগে অভিমানে ফুলে উঠল মানিনী—ভগবান আমাকে অপ্সরা করে পাঠিয়েছেন পুরুষ মানুষদের মন জয় করতে। তা জেনেও ব্রহ্মা আপনি আমায় উপহাস করলেন? আমিও বলছি শুনুন, পৃথিবীতে কেউ আপনাকে পুজো করবে না। যে করবে, তাকে বিপদে পড়তে হবে। এই বলে মানিনী সেখান থেকে চলে গেল।

মানিনীর কথা শুনে ব্রহ্মার তো গেল মাথা ঘুরে। বিষধর সাপের ছোবলে যেমন বিষ, মনের কষ্টে কোন মেয়ে যদি হঠাৎ কোন শাপ-শাপান্ত করে বসে, তাহলেও তা তেমনি বিষ। লাগবেই লাগবে। ব্রহ্মার মন খারাপ হয়ে গেল।

মুনিরাও ব্রহ্মার ওপর মানিনীর অভিশাপ শুনে খুব দুঃখ পেলেন। বললেন—ভগবান, আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে যান। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে অভিশাপমুক্ত করবেন। মুনিরা এই বলে চলে গেলেন!

মুনিদের কথা তো আর ঠেলতে পারেন না ব্রহ্মা। রোগ হলে বৈদ্যর কাছে যেতেই হয়। সবাই বললেন—অভিশাপমুক্ত করতে নাকি একমাত্র বিষ্ণুই পারবেন। মনে মনে ক্ষোভ জাগল ব্রহ্মার। এই ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা তিনি নিজে। আর এখন কিনা তাঁকে যেতে হবে বিষ্ণুর কাছে—যে তাঁর থেকে অনেক ছোট। এখন মাথা নিচু করতে হবে তাঁর কাছে।

কিন্তু উপায় নেই। সকলেই যখন বলছেন তখন যেতেই হয়।

পায়ে পায়ে বৈকুণ্ঠে এসে হাজির হলেন ব্রহ্মা। দেখলেন লক্ষ্মীদেবীকে পাশে নিয়ে রত্ন-সিংহাসনে বসে আছেন বিষ্ণু। দাসীরা চামরের বাতাস করছে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে দেখেই সিংহাসন ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসে হাত ধরে নিয়ে গেলেন বিষ্ণু। বসালেন তাঁকে একটা সিংহাসনে।

সবই জানেন বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি ঘটছে, কিছুই অজানা নেই তাঁর। তবু তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার বিধাতা? হঠাৎ এখানে? অমন শুকনো মুখ কেন? কি হয়েছে?

চতুর্মুখ ব্রহ্মা অকপটে সব বললেন। যে মুহূর্তে জিজ্ঞেস করতে যাবেন, এখন কি উপায়, ঠিক সেই সময় দ্বারী এসে বিষ্ণুকে খবর দিল—অন্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে দশানন ব্রহ্মা এসেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর নাকি খুব জরুরি প্রয়োজন। একবার দেখা হওয়া দরকার।

—তাই নাকি? বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

সেই সঙ্গে ইশারায় বিধাতাকেও বলে দিলেন একটু অপেক্ষা করতে।

দশানন ব্রহ্মা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাজ মিটিয়ে বাইরে গেলেন তো আর এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে শতমুখ ব্রহ্মা এসে হাজির হলেন। তাঁর কাজ মিটল তো কোথা থেকে অসম্ভব প্রবীণ হাজার মুখ আর এক ব্রহ্মা এসে তেমন ভাবেই প্রণাম জানিয়ে বিষ্ণুর কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে চলে গেলেন।

বসে বসে সবই দেখেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। আর লজ্জায় নিজের মাথা নিজেই কুটে মরেন। এসব দেখে-শুনে, বিধাতার মনে হতে লাগল ছিঃ ছিঃ, চারটে মুখ নিয়ে মনে মনে এত অহঙ্কার কিভাবে তিনি পোষণ করতেন! এখানে আসার আগে পর্যন্ত যেটুকু দম্ভ, অহঙ্কার ছিল, তা মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যাই হোক, নারায়ণ অবশ্য ব্রহ্মার সমস্যার সব সমাধান করে দিয়েছিলেন ঠিকই—তবে, তাঁর মনের দম্ভকে ভেঙে দিয়ে।

অষ্টাবক্র কাহিনী

বৃন্দাবনে চলেছে রাস-উৎসব। ষোলশ গোপিনীর সঙ্গে রাধা রসামঞ্চকে ঝলমল করে রেখেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের সঙ্গে সমান ভাবে খেলা করলেও, সকলের প্রার্থনা সমান ভাবে পূরণ করলেও, রাধার ব্যাপারটাই ছিল আলাদা। তিনি কোন সময়ই কিন্তু রাধার কাছছাড়া হন নি।

উত্তাল বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে যখন এভাবে চলেছে কৃষ্ণের রাসলীলা, হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন এক মুনি। একেবারে উলঙ্গ, আবলুস কাঠের মত গায়ের রং, হাড্ডিসার, কোথাও একটু মাংসের নাম-গন্ধ নেই। হাতের নখ থেকে পায়ের নখ বড় হতে হতে যে কত লম্বা হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ধকধক করে জ্বলছে চোখ দুটো। যেন জোনাকির মত আলো। আর সারা দেহটাই বাঁকা-বাঁকা। দেখলেই মনে হবে, তাঁকে সাপটে ধরে তাঁর দেহটা কে যেন চারদিক থেকে দুমড়ে-চুমড়ে দিয়েছে। আর বয়সের বোধ হয় গাছ-পাথর নেই।

তাঁকে আসতে দেখেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা বন্ধ করে রাধাকে ছেড়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চলন দেখে মুখে কাপড় চেপে যেই ফিকফিক করে হেসে উঠল রাধা, অমনি শ্রীকৃষ্ণ ইশারায় তাকে থামিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন—উ...হু... হেসো না রাধা। রাধাও চুপ করে গেল।

ইতিমধ্যে প্রায় মুখোমুখি আসতেই শ্রীকৃষ্ণ সব ভুলে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিজের বুকে সজোরে চেপে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

অতবড় একজন পুরুষ, যাঁকে সবাই নরদেহধারী ভগবান বলে জানে, সামান্য একজন মানুষের মত তাঁকে ঐভাবে একজন মুনিকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে দেখে রাধা তো গেল ভ্যাবাচাকা খেয়ে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল রাধা। দেখল, যত কাঁদেন শ্রীকৃষ্ণ, তত কাঁদেন সেই সর্বাঙ্গ–বাঁকা মুনি। তাঁর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পিঠ।

তারপর রাধা একসময় দেখল, শ্রীকৃষ্ণের বুকের ওপরই ঢলে পড়লেন মুনি। বেরিয়ে গেল তাঁর প্রাণবায়ু—শেষ নিঃশ্বাস। আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে এত ছাই যে, চারদিক যেন ঢেকে গেল তাতে।

আস্তে আস্তে তাঁর মৃতদেহটা শুইয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে চন্দনকাঠের চিতা সাজিয়ে সেই মুনির সৎকার করলেন।

সব যখন মিটে গেল, আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ।

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না রাধা।

জিজ্ঞেস করল—কৃষ্ণ, কে এই মুনি? দেখলাম, বিকৃত ঐ মুনিকে দেখে তোমার চোখে জল? কি ব্যাপার, বল না! আর মুনি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন অত ছাই বের হল কেন?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—জান রাধা, সে এক কাহিনী।

বহু, বহুকাল আগে প্রলয় হয়ে যাবার পর পৃথিবীতে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে আবার যখন নতুন করে প্রজাসৃষ্টি করছিলেন, তখন অসিত নামে একজন ভক্তিমান রাজা ছিল। শিবের তপস্যা করে সে পেয়েছিল শিবের মতই এক ছেলে। নাম দেবল। ছেলে যখন বড় হয়ে উঠল অসিত জাঁকজমক করে তার বিয়ে দিল। দেবলও স্ত্রীকে নিয়ে একশ বছর পরমানন্দে ঘর-সংসার করল বটে, কিন্তু সংসারে ঠিক মন বসত না। খুবই ভালবাসত দেবল তার স্ত্রীকে। তবুও একদিন এমন হল, গভীর রাতে স্ত্রী যখন ঘুমিয়ে, বাড়ির আর সব মানুষেরা যখন ঘুমিয়ে, চুপি চুপি বাড়ি ছেড়ে, সংসারের মায়া কাটিয়ে দেবল চলে গেল একেবারে নিরালা, নির্জন গন্ধমাদন পর্বতে। সেখানে একটা গুহায় বসে শুরু করে দিল তপস্যা। ঘুম থেকে উঠে স্ত্রী রত্নমালা স্বামীকে দেখতে না পেয়ে শোকে-দুঃখে প্রাণ দিল।

প্রায় হাজার বছর ধরে চলল দেবলের তপস্যা।

একদিন স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা ঘুরতে ঘুরতে এল গন্ধমাদনে। সুপুরুষ, সুদর্শন দেবলকে দেখে সে থমকে দাঁড়াল। যেমন সুপুরুষ, তপস্যার তেজও তেমনি ফুটে বের হচ্ছে তার দেহ থেকে।

স্বর্গের অপ্সরা রম্ভা। যারা শুধু দেবতাদেরই আসরে নাচগান করে, মনে ফুর্তি আনে, সামান্য একজন তাপস দেবলকে দেখে, সেই রম্ভা ভুলে গেল স্বর্গের কথা। আপ্রাণ চেষ্টা করল তাঁর তপস্যা ভাঙিয়ে তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধতে।

কিন্তু যখন দেখল, দেবল তাকে উপেক্ষা করে আবার তপস্যায় ডুবে গেল, তখন রম্ভা অপমানে, দুঃখে-রাগে আগুন হয়ে উঠে অভিশাপ দিয়ে বসল দেবলকে। বলল—এত অহঙ্কার তোমার? দেবতারা আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। আর তুমি সামান্য একজন তাপস হয়ে আমাকে অপমান করলে? শোন মুনি, তোমার এই রূপ-যৌবনের অহঙ্কার ধ্বংস হয়ে যাবে। বিকৃত কদাকার হবে তোমার চেহারা, যা দেখলে লোকে তোমাকে উপহাস করবে। তপস্যা করে অনেক শক্তি অর্জন করেছ, না? আমি বলছি, ও শক্তি আর তোমার একটুও থাকবে না। বলে রম্ভা চলে গেল।

—সে কি কৃষ্ণ? শুনে চমকে ওঠে রাধা!

—হ্যাঁ, তাই। মৃদু হেসে বললেন শ্রীকৃষ্ণ—মেয়েরা যা চায়, তা যদি না পায়, এই রকমই রেগে যায়। আর তখন মুখে যা আসে, তাই বলে বসে। বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যাই হোক, তারপর শোন।

দেবল যেন ও সব কথা শুনেও শুনতে পেল না। যেমন তপস্যায় শ্রীহরির ধ্যান করছিল, তেমনি করতেই থাকল।

কিছুদিন পর থেকেই দেবলের কিন্তু শুরু হল অস্বস্তি। ধ্যানে যেমন আগে শ্রীহরির সঙ্গে প্রায় মিশে যেত, সে রকমটি যেন আর হচ্ছে না। চোখের সামনে সব সময় পাদপদ্ম ভাসত, তাও আর ভাসে না। তারপর দেখল, অল্পদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য গেল, রূপের সেই জৌলুস গেল। কালো হয়ে গেল চেহারা। সেই সঙ্গে সারা দেহটার আটটা জায়গা গেল তাঁর

বেকে। এত বছর ধরে তপস্যা করে যে শক্তি সে অর্জন করেছিল তার এতটুকুও আর তখন ছিল না তার মধ্যে।

—এমন কি হয় কৃষ্ণ? বাধা দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে রাধা।

—হয় বৈকি রাধা। মনে যদি কারো খুব কষ্ট হয়, আর সেই কষ্ট থেকে কেউ যদি কোন অভিশাপ দিয়ে বসে, জানবে, তা লাগবেই লাগবে। সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। সেজন্যই তো সকলকেই চেষ্টা করতে হয়, কেউ যেন মনে কোন কষ্ট না পায়, দীর্ঘশ্বাস না ফেলে।

শুনে চুপ করে যায় রাধা। শ্রীকৃষ্ণ আবার বলতে লাগলেন।—

এতদিনের সাধনা সব গেল দেখে, তার ওপর এই কুরূপ, কদাকার চেহারা—দেবল আর সহ্য করতে না পেরে একদিন উদ্যত হল আত্মহত্যা করতে। কাঠ যোগাড় করে, চিতা সাজিয়ে, আগুন জ্বেলে প্রাণ বিসর্জন দিতে যাবে, সনাতন ভগবান আমি শ্রীকৃষ্ণই সেদিন ওকে বাধা দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আজ থেকে তুমি প্রসিদ্ধ হবে অষ্টাবক্র মুনি নামে। এভাবে জীবন নষ্ট করবে কেন? তুমি আমার ভক্ত। আমার ভক্ত কখনো এভাবে মরতে পারে না। তুমি গন্ধমাদন ছেড়ে মলয় পাহাড়ে যাও। সেখানে আবার নতুন করে তপস্যা কর। সময় এলে, আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমার কথা শুনে অষ্টাবক্র মুনি চলে গিয়েছিল মলয় পাহাড়ে। অনাহারে থেকে সুদীর্ঘ ছয় হাজার বছর তপস্যা করে, আজ আমারই ইচ্ছায় আমারই কাছে এসেছিল মুনি। আজ যে ছিল ওর মুক্তির দিন। এত বড় ভক্ত কোন ভগবান পায় রাধা? জানি, আজ আমার ভক্ত আমারই গোলোকধামে চলে গেল, তবু ছেড়ে দিতে কি কষ্ট হয় না রাধা? আর ওর শেষ নিঃশ্বাস থেকে অত ছাই কেন বের হল জান? মানুষের শরীরে যখন, তখন খিদে থাকে, তেষ্টা থাকে। পেটের আগুন কি নিভে যায়? বাইরের খাবার না পেয়ে সেই আগুন অষ্টাবক্রের ভেতরটাই খেয়ে ছাই করে ফেলেছিল—হাড়ের লেশমাত্রও ছিল না ওর ভেতরে। তাই তো ওর প্রাণবায়ুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল অত ছাই।

শুনতে শুনতে রাধার চোখও অষ্টাবক্রের জন্য ছলছল করে উঠল।

অষ্টাবক্রের আর এক কাহিনী

মহামুনি উদ্দালকের ছেলে শ্বেতকেতুকে আজ কে না জানে? অমর হয়ে আছেন তিনি আজও তাঁর জ্ঞানের জন্য। অষ্টাবক্র হলেন এই শ্বেতকেতুরই ভাগ্নে।

মহর্ষি উদ্দালক তাঁর আশ্রমে অনেক ছেলেপুলেকেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন। কত যে শিষ্য ছাত্র সারা জীবন ধরে নাড়াচাড়া করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কাহোড়ের মত শিষ্য এতদিনে একটা চোখে পড়ে নি তাঁর। অল্প বয়সেই এমন মেধাবী, বিচক্ষণ—তার ওপর এমন সেবা শুশ্রূষা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন উদ্দালক।

তাই যেদিন ব্রহ্মচর্য আশ্রমে তাঁর থাকার দিন শেষ হল, গুরুদেব উদ্দালক তার কাছ থেকে গুরুদক্ষিণা নেয়া তো দূরের কথা, নিজের মেয়ে সুজাতার সঙ্গে গটা করে বিয়ে দিয়ে কাহোড়কে জামাই করে দিলেন।

গৃহস্থাশ্রমে এসে সুজাতাকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতলেন কাহোড়। কিছু শিষ্য ছাত্র জুটল। মনের আনন্দে কাহোড় তাদের বেদ থেকে শুরু করে শাস্ত্র-গ্রন্থ পড়াতেন। আর সুজাতা থাকতেন গেরস্থালি নিয়ে।

কোন রকমে চলে যাচ্ছিল কাহোড়-সুজাতার সংসার। কিন্তু একদিন সেই সুখের সংসারেও ঘটল বিভ্রাট।

সুজাতা হয়েছেন সন্তান-সম্ভবা। সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে আসবে ঘরে তাদের। কাহোড়ও মনে মনে খুব খুশি। ছাত্রদের পড়াশুনা করিয়ে

যতটা সম্ভব নজর রাখতেন তিনি সুজাতার দিকে। চেষ্টা করতেন এই সময় কোন কারণে সুজাতার মনে যেন কোন দুঃখ বা কষ্ট না আসে।

দিন ক্রমশই এগিয়ে আসে। তবে তার জন্য খুব একটা চিন্তিত নন কাহোড়। দিনরাত বেদপাঠ, বেদচর্চা, শাস্ত্র অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা নিয়েই কাটান।

একদিন সকালে বসে আছেন কাহোড়। তাঁর চারদিক ঘিরে শিষ্যের দল। একটু তফাতে বসে সুজাতা। হঠাৎ আকাশবাণীর মত শোনালেও সকলেই দেখলেন সুজাতার গর্ভস্থ শিশু, কাহোড়ের ভাবী ছেলে, বলে উঠলেন—'বাবা, আপনি সারারাত বেদপাঠ করেন, আমি শুনেছি। আপনার আশীর্বাদে ইতমিধ্যেই আমার সব বেদ শেখা হয়ে গেছে। আমি লক্ষ্য করছি আপনার বেদপাঠ ঠিক হচ্ছে না, ভুল হচ্ছে।'

শুনে সুজাতা তো অবাক হলেনই, আর সকলেও অবাক। জন্মাতে না জন্মাতেই এত বড় পণ্ডিত, সে কাহোড়ের ভুল ধরছে। জন্মালে না জানি কি হবে। কাহোড়ের কিন্তু সেই মুহূর্তে সে চিন্তা আসেনি। অত ছেলেপুলের সামনে ভুল ধরেছে তাঁর, এমন একটা ছেলে যে, এখনও জন্মায়নি। খুব রেগে গিয়ে দিয়ে বসলেন অভিশাপ—'জন্মাবার আগে যখন মনে মনে তুমি এত বাঁকা, তখন শরীরের আট জায়গায় বাঁকা নিয়ে তুমি জন্মাও।'

রাগের মাথায় অভিশাপ তো দিয়ে বসলেন। তার পরেই মনস্তাপ। কিন্তু মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে গেছে একবার, তখন আর তো কিছু করার নেই।

দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, কাহোড়ের সংসারে ততই অনটন বাড়তে লাগল। খুব কষ্টে পড়লেন তিনি। অথচ, এই সময় তাঁর অর্থের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

বিদর্ভরাজ রাজর্ষি জনক। যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি ধার্মিক, আবার তেমনি তাঁর দান-ধ্যান। সুখ্যাতি তাঁর চারদিকে। কাহোড় প্রার্থী হয়ে একদিন গিয়ে হাজির হলেন জনকরাজের সভায়।

জনকরাজার সভায় ছিলেন এক সভাপণ্ডিত। যিনিই রাজার কাছে প্রার্থী হয়ে যেতেন, তাঁকেই তিন তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন। আর কুটিল কুটিল

প্রশ্নে তাঁদের হারিয়ে দিতেন। তারপর জনকরাজ জানতেন না যে, হেরে যাওয়া পণ্ডিতরা কোথায় যেতেন। সভাপণ্ডিত গোপনে লোক দিয়ে তাঁদের ফেলে দিতেন সমুদ্রের জলে। কাহোড় এসব কিছুই জানতেন না। রাজসভায় প্রার্থী হয়ে যেতেই সভাপণ্ডিতের সঙ্গে হল তাঁর তর্কযুদ্ধ। যথারীতি কূট প্রশ্ন করে সভাপণ্ডিত কাহোড়কে হারিয়ে লোক দিয়ে ফেলে দিলেন সমুদ্রে। কাহোড়ের মৃত্যু হল।

খবর এল সুজাতার কাছে যে তাঁর স্বামী আর ইহজগতে নেই। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে এসে উঠলেন আবার বাবা উদ্দালকের কাছে।

শুনে মহর্ষি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কি আর করার আছে মা? সবই ভাগ্য। তুই আমার কাছে থাক। বলে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন উদ্দালক। তারপর বললেন—আর একটা কথা মা, তোর ছেলেকে যেন কোন দিন এসব কথা শোনাস নি।

যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হল সুজাতার ছেলে। কাহোড়ের সেই অভিশাপ বৃথা যায় নি। সত্যি সত্যিই শরীরের আটটা জায়গা তার বাঁকা। কেমন যেন বিশ্রী। দাদু উদ্দালক তার নামই রাখলেন তাই অষ্টাবক্র। কোলে তুলে নিলেন। সেই থেকে অষ্টাবক্র বড় হয়ে উঠতে লাগলেন উদ্দালকের কোলে-পিঠে। তাঁকেই তিনি মনে করতেন তাঁর বাবা আর শ্বেতকেতুকে তাঁর ভাই। সুজাতাও কোন দিনই অষ্টাবক্রের এই ভুল ভাঙিয়েও দেন নি। কেননা, বাবা উদ্দালকের কাছে কথা দিয়েছিলেন, ছেলের কাছে কোন দিন তিনি কাহোড়ের প্রসঙ্গ তুলবেন না।

দেখতে দেখতে অষ্টাবক্রের বয়স হল বারো বছর। মামা শ্বেতকেতুও প্রায় সমবয়সী। দুই জনের মধ্যে ভাব-ভালবাসাও খুবই।

একদিন অষ্টাবক্র বসে আছেন উদ্দালকের কোলে। তাই দেখে শ্বেতকেতু দৌড়ে এসে তাকে টেনে নামিয়ে দিল উদ্দালকের কোল থেকে। বলল—সব সময় আমার বাবার কোলে বসে থাকিস কেন রে? নিজের বাবার কোলে গিয়ে বসতে পারিস না?

অষ্টাবক্র তো শুনে হতভম্ব। বলে কি শ্বেতকেতু? উদ্দালক তাহলে তাঁর বাবা নন! জন্মে অবধি জেনে আসছেন ইনিই তাঁর বাবা। এমন হঠাৎ ঘটে গেল ঘটনাটা যে, উদ্দালকও সামাল দেবার সময় পেলেন না।

মুখ ভার করে অষ্টাবক্র মা সুজাতার কাছে এসে বললেন—মা, তুমি এতদিন বল নি কেন যে উনি আমার বাবা নন? আমার বাবা কোথায়? উনিই-বা আমার কে?

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না সুজাতা। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—বাবা, উনি তোমার দাদু মহর্ষি উদ্দালক, শ্বেতকেতু তোমার মামা।

এই প্রথম অষ্টাবক্র পেলেন তাঁদের আসল পরিচয়।

—আর তোমার বাবা...। বলতে গিয়ে চোখ ছলছল করে উঠল সুজাতার। গলা ভারী হয়ে এল—তোমার বাবা কাহোড়কে জনক রাজার সভাপণ্ডিত তর্কযুদ্ধে হারিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে মেরে ফেলেছেন।

—অ্যাঁ? শুনে চমকে উঠেন অষ্টাবক্র—তর্কযুদ্ধে হারিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মেরেছে!

—হ্যাঁ, বাবা। দুর্ভাগ্য আমাদের। এ ছাড়া আর কি বল। নিজের মনেই নিজের সঙ্গে ছেলেকেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন সুজাতা।

অষ্টাবক্রও চুপ করে গেলেন।

পরদিনই অষ্টাবক্র নিরালায় ডাকলেন মামা শ্বেতকেতুকে। বললেন—মামা, শুনলাম জনকরাজা নাকি বিশাল শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। চল না। সেখানে যাই, কত দেশ-দেশান্তর থেকে মহা মহা পণ্ডিতেরা আসেন, তাঁদের দেখাও হবে, আবার আলোচনা শুনে খানিক জ্ঞানও লাভ করা যাবে। চাই কি কিছু রোজগারও যে হবে না, তাই-বা কে বলতে পারে?

অষ্টাবক্রের কথাটা খুবই মনে ধরে গেল শ্বেতকেতুর। বললেন—মন্দ বল নি ভাগ্নে। চল, যাওয়াই যাক।

কাউকে কিছু না বলে মামা-ভাগ্নে দুই জনে এসে হাজির জনক রাজার সভায়।

সভায় ঢুকতে যাবেন কি পথ আটকাল দ্বারী—কোথাও যাও।

—সভায়। স্পষ্ট জবাব অষ্টাবক্রের।

—এটা শাস্ত্রবিচারের সভা। ছোটদের ঢোকার অনুমতি নেই।

—কার হুকুম? রাজার? জিজ্ঞেস করেন অষ্টাবক্র।

—না। সভাপণ্ডিতের। বলল দ্বারী।

—ছোটদের কথা কি বললে? আমাদের দেখে? হ্যাঁ, বয়সে আমরা ছোট ছেলে ঠিকই তবে তোমাদের সভাপণ্ডিতকে গিয়ে বলতে পার, শাস্ত্রবুদ্ধিতে আমরা ছেলেমানুষ নই।

জনকরাজা সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে গিয়ে বিকৃতদর্শন অষ্টাবক্রের কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। একটু অবাকও হলেন ঐটুকু ছেলের মুখে অমন কথা শুনে।

—কি চাও তোমরা? জিজ্ঞেস করলেন জনক।

—শুনলাম আপনি শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। আর আপনার সভাপণ্ডিতও নাকি দারুণ পণ্ডিত। তাই এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে। বললেন অষ্টাবক্র।

—ও চেষ্টা কোরো না বালক। এটা ছেলেমানুষির জায়গা নয়। ফিরে যাও।

—ফিরে যেতে তো আসি নি রাজা। আর ছেলেমানুষিও করতে আসি নি। আপনি নিজে তো একজন শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ। যাচাই করে দেখুন না, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি কিনা।

শুনে খুবই কৌতূহল জাগল রাজার। বারো বছরের ছেলে। বলে কি? ঠিক করলেন একটু বাজিয়েই দেখবেন। বেশ কয়েকটা প্রশ্নও করলেন। অষ্টাবক্র সঙ্গে সঙ্গে তার জবাবও দিয়ে দিলেন।

জনক বললেন—আর একটা প্রশ্ন করব, যদি ঠিক জবাব দিতে পার, তাহলে আমি বলছি, দ্বারী তোমাদের পথ ছেড়ে দেবে।

—জিজ্ঞেস করুন। অষ্টাবক্র নির্ভীক।

—বল তো, কে চোখ না বুঝে ঘুমোয়? জন্মাবার পরেও কেউ টু শব্দ পর্যন্ত করে না? বল তো কার হৃদয় বলে কোন বস্তু নেই? কে দারুণ বেগে বেড়ে ওঠে?

প্রশ্ন শুনে হাসলেন অষ্টাবক্র। বললেন—রাজা, এর প্রত্যেকটারই জবাব দিচ্ছি শুনুন। মাছ চোখ না বুঝেই ঘুমোয়। ডিম ভূমিষ্ঠ হয়েও কোন শব্দ তোলে না। পাষাণের কোন হৃদয় নেই। আর নদীর মত এত বেগে কেউ বাড়তে পারে না।

উত্তর শুনে খুবই খুশি হলেন জনক। বললেন—না, একেবারে বালক বলে তোমাদের উপেক্ষা করা যায় না। যাও ভেতরে।

বীরদর্পে মামা-ভাগ্নে সভায় ঢুকলেন। ঢুকেই তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন সভাপণ্ডিতকে।

অষ্টাবক্র সরাসরি বললেন—এই শাস্ত্রবিচারে আমার একটা শর্ত আছে। যে হারবে, তাকে সমুদ্রের জলে ডুবে মরতে হবে।

শর্তে রাজি সভাপণ্ডিত।

শুরু হল তর্কযুদ্ধ। বিশাল সভায় মহা মহা সব পণ্ডিতের দল চুপচাপ বসে।

সভাপণ্ডিত একটা করে কূট প্রশ্ন রাখেন। তাও আবার অসমাপ্ত। অষ্টাবক্র মুহূর্তে প্রশ্নটিকে সম্পূর্ণ করে তার উত্তর দিয়ে দেন। যত এই রকম ফাঁদে ফেলা প্রশ্ন রাখেন সভাপণ্ডিত, তার সবকটিরই জবাব মুহূর্তে দেন অষ্টাবক্র। দেখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান পণ্ডিতের দল। হতবাক হয়ে নিজের আসনে বসে থাকেন রাজা জনক।

দেখতে দেখতে মুখ কালো হয়ে যায় সভাপণ্ডিতের। মাথা নিচু হয়ে যায়। সভায় ওঠে অষ্টাবক্রের জয়ধ্বনি।

—তাহলে পণ্ডিত, এবার শর্ত পালন করুন। বলেন অষ্টাবক্র—রাজা আপনার এই পণ্ডিত, প্রার্থী হয়ে যে পণ্ডিতই আপনার কাছে এসেছেন, তাঁদেরই শাস্ত্রের কূট ফাঁদে ফেলে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন। এমন কি আমার বাবা কাহোড়কেও।

শুনে চমকে ওঠেন জনক রাজা—সে কি?

মাথা না তুলেই সভাপণ্ডিত বললেন—আমি বরুণ রাজার ছেলে। সমুদ্রতলে আমার বাবাও রাজা জনকের মত বারো বছর ধরে শাস্ত্রযজ্ঞ করছেন। তা দেখবার জন্যই পণ্ডিতদের সেখানে পাঠিয়েছি।

—তাই নাকি? বিদ্রূপ করে বললেন অষ্টাবক্র—তাহলে রাজা, উনি যখন বরুণ রাজারই ছেলে, তখন বাপের কাছে ফিরে যেতে কোন অসুবিধেই নেই।

বিচক্ষণ রাজা অষ্টাবক্রের কথা অনুমোদন করলেন। সভাপণ্ডিতকে জীবন্ত ফেলে দেয়া হল সুমদ্রের জলে।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা।

জনক রাজা দেখলেন, দিব্যদেহধারী হাজার হাজার পণ্ডিত যেন সমুদ্রজল থেকে উঠে এলেন। তাঁর মধ্যে অষ্টাবক্রের বাবা কাহোড়ও। তিনি এগিয়ে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজাও প্রাণ ভরে মঙ্গল কামনা করলেন—অপমৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য।

অষ্টাবক্রকে বললেন—বাবা, আমারই অভিশাপে তুমি অষ্টাবক্র হয়ে জন্মেছ। রাগের মাথায় যেদিন তোমাকে আমি অভিসম্পাত দিয়েছিলাম, সেদিন থেকেই আমার মনে একটা কষ্ট ছিল। এখন শোন বাবা, তুমি সমঙ্গা নদীতে গিয়ে স্নান-কর। আবার তোমার দেহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

জনক রাজার কাছ থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে মামা-ভাগ্নে আবার ফিরে এলেন নিজেদের আশ্রমে। তারপর বাবা কাহোড়ের পরামর্শ অনুযায়ী অষ্টাবক্র যেই সমঙ্গার জলে স্নান সেরে উঠলেন, অমনি কোথায় গেল সেই বাঁক-চুর!

এখন দেখলে কে বলবে এই সেই অষ্টাবক্র ছেলে।

নামটা কিন্তু তাঁর অষ্টাবক্রই থেকে গেল।

[পাঠকের জানার সুবিধের জন্য অষ্টাবক্র মুনি সম্বন্ধে এই কাহিনীটি 'মহাভারত' থেকে এখানে তুলে দেয়া হল, 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে' বর্ণিত কাহিনীর অনুপূরক হিসেবে]।

ইন্দ্রের বোধোদয়

দেবরাজ ইন্দ্র পুরন্দর। স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের রাজা তিনি। ক্ষমতা অর্জন না করলে কি আর স্বর্গরাজ্যের রাজা হওয়া যায়?

বহু যাগযজ্ঞ করে সত্যি সত্যিই পুরন্দর সে ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির আশীর্বাদ নিয়ে অমরাবতীর প্রাসাদে রত্ন সিংহাসনে বসে ত্রিলোকের ওপর আধিপত্যও শুরু করেছিলেন। কত ক্ষমতা তাঁর! তাঁর কথায় চলছেন দেবতারা। গন্ধর্ব কিন্নররা আলো করে থাকে তাঁর সভা। অপ্সরারা নাচ-গান করে। শচীদেবীকে নিয়ে পুরন্দরের সে বড় সুখের রাজত্ব।

যেখানে সুখ-ভোগ-বিলাসিতা, সেখানেই আসে বিভ্রম।

পুরন্দরেরও হল সেই অবস্থা। রাজপদে বসে আগের সব কথাই তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন।

একদিন দেবসভায় দেবতাদের সঙ্গে বসে আছেন গুরুদেব বৃহস্পতি। প্রতিদিনই থাকেন। দেবতারা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশেষ একটা আসনে বসিয়ে রাখেন। দেবরাজ আসেন। আগে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তারপর গিয়ে বসেন তাঁর সিংহাসনে। দেবসভায় এই নিয়মটাই চলে আসছিল আবহমান কাল।

পুরন্দর সেদিন কিন্তু মনে মনে এমন মদমত্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, দেবগুরুকে উপেক্ষা করে গিয়ে বসলেন নিজের সিংহাসনে। শুরু করে দিলেন রাজকাজ। যেন গুরুদেবকে দেখতেই পেলেন না।

মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলেন দেবগুরু শিষ্যের এই ঔদ্ধত্য দেখে।

সেদিন কিছু না বলে সভা ভাঙার পর ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। মনে মনে কিন্তু ঠিক করলেন একটা উচিত শিক্ষা দিতে হবে তাঁকে। পরদিন ভোর হতে না হতেই বৃহস্পতি বাড়ি ছেড়ে এক বনে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন।

রাতে বিশ্রাম করতে গিয়ে হঠাৎ পুরন্দরের মনে হল, কাজটা ভাল হয় নি। গুরুকে এভাবে অবহেলা করাটা মোটেই উচিত হয় নি। সকাল হলেই আগে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

সকাল হতেই ছুটে এলেন পুরন্দর। কিন্তু কোথায় গুরুদেব? বৃহস্পতির স্ত্রী গুরু-মা তারা দেবী বলে দিলেন—কি জানি বাবা, কোথায় যে উনি চলে গেলেন, তা তো বলতে পারব না। শুধু বলে গেছেন, ফিরতে দেরি হবে।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন পুরন্দর। এবার কি হবে। তিনি রাজা হতে পারেন, কিন্তু সব কিছুর মন্ত্রণাদাতা যে উনি। গুরু স্বর্গরাজ্যে আছেন বলেই তো অসুররা চট করে কিছু করতে সাহস করে না। লক্ষ্মী তাঁর প্রাসাদে অচলা হয়ে আছেন।

মা-বাবা রাগ করলে তবু রক্ষে আছে। কিন্তু শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, প্রাণদাতা গুরু যদি বিরূপ হন তাহলে দুর্গতির আর শেষ থাকে না।

হলও তাই। দেবরাজ্য গেল। ইন্দ্র পালালেন প্রাণভয়ে! দেবতারা নহুষকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন ইন্দ্রের সিংহাসনে, অসুরদের ঠেকাবার জন্য। সিংহাসনে বসে নহুষেরও গেল মাথা ঘুরে। দেবরাজ হিসেবে স্বর্গের সব কিছু ভোগ করার অধিকার যখন তাঁর, তখন শচী কেন তাঁর স্ত্রী হবেন না? ভয়ে শচীদেবী প্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গুরু-মা তারা দেবীর কাছে। নহুষকেও অবশ্য এর জন্য দারুণ সাজা পেতে হয়েছিল। সে আর এক কাহিনী।

যাই হোক, এদিকে রাজ্য হারিয়ে পুরন্দর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন যাচ্ছিলেন মন্দাকিনী নদীর পাশ দিয়ে। যেতে যেতে দেখলেন গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যাকে। নদীতে স্নান সেরে নিজের কুটিরে ফিরছিলেন তিনি। তাঁকে দেখে ইন্দ্রের মাথা গেল ঘুরে। মুনি-পত্নী ছিলেন সতী-সাধ্বী। ইন্দ্র করলেন কি, গৌতম যখন বাড়িতে ছিলেন না,

সেই সুযোগে গৌতমের ছদ্মবেশ ধরে তার কুটিরে গিয়ে অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করলেন। কিন্তু পালাতে না পেরে ধরা পড়ে গেলেন গৌতমের কাছে। গৌতম যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান তো করলেনই ইন্দ্রকে, সেই সঙ্গে তাঁর অভিশাপে ইন্দ্রের সারা দেহে সৃষ্টি হয়ে গেল এক হাজার চোখের মত ঘা। দীর্ঘকাল ইন্দ্র সেই ঘায়ের জ্বালা আর দুর্গন্ধ ভোগ করলেন। তারপর সেই ঘাগুলো তাঁর দেহে চোখ হয়ে রইল। সেই থেকে ইন্দ্র হয়ে গেলেন সহস্রলোচন।

এখানেই কিন্তু থামল না ইন্দ্রের কুকাজ।

দেবরাজ্য ফিরে পাবার জন্য ত্বষ্টার ছেলে মহাযোগী বিশ্বরূপকে দিয়ে সকলের পরামর্শে যজ্ঞ করালেন। আবার সেই বিশ্বরূপকেই প্রাণে মেরে বসলেন। ত্বষ্টা গেলেন দারুণ রেগে। তিনিও ঠিক করলেন পুরুন্দরকে খতম করবেন। মনস্থ করে তিনি ব্রহ্মহত্যা নামে এক পিশাচ সৃষ্টি করে পাঠিয়ে দিলেন ইন্দ্রকে চিবিয়ে খাবার জন্য।

পিশাচ ব্রহ্মহত্যা—মিশমিশে কালো, বিকট আকার। পাহাড়ের চুড়োর মত দাঁত বের করা, শিরা ফোলা, হাড়সর্বস্ব, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে ছুটে আসতে লাগল ইন্দ্রকে ধরবার জন্য। দেখেই তো ইন্দ্রের প্রাণ খাঁচাছাড়া। পরিত্রাণ পাবার জন্য দিলেন ছুট। ইন্দ্রও ছোটেন, পেছনে ছোটে ব্রহ্মহত্যা। কত ক্রোশ পথ যে ইন্দ্র ছুটলেন, কত পাহাড় যে ডিঙোলেন, তার ইয়ত্তা নেই। পিছনে ঠিক সেই ভাবেই তেড়ে আসছে ব্রহ্মহত্যা। ছোটেন ইন্দ্র, আর মনে মনে ডাকেন। গুরুদেবকে—'গুরুদেব, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।' বারবার আকুল হয়ে তাঁকে ডাকেন আর ছোটেন। ছুটতে ছুটতে এলেন মানস সরোবরে। খুবই হাঁফিয়ে পড়েছেন তিনি তখন। পেছন ফিরে দেখেন, ব্রহ্মাহত্যা এই বুঝি এসে পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর। আর কোন উপায় নেই দেখে ইন্দ্র ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানস সরোবরে। কাঁপতে কাঁপতে শালুক ফুলের মৃণালের মধ্যে দিয়ে আত্মগোপন করলেন। এক মনে ডাকতে লাগলেন গুরুদেবকে। ব্রহ্মহত্যাও সরোবরের তীরে একটা গাছে উঠে অপেক্ষা করে রইল সকলের চোখের আড়ালে।

গুরুকে অপমান করার যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন ইন্দ্র, এই ভেবে এবার গুরুদেব বৃহস্পতি বেরিয়ে এলেন তাঁর গোপন স্থান থেকে। মানস সরোবরের তীরে এসে ডাকলেন—পুরন্দর, তুমি কোথায়?

গুরুদেবের গলার স্বর শুনে খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন ইন্দ্র। বললেন—গুরুদেব, আমি মৃণালের ভেতর।

—বেরিয়ে এস, পুরন্দর। ফিরে যাও তোমার রাজ্যে।

মনে মনে ইন্দ্র খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। গুরুদেবের কৃপা তাহলে মিলেছে। এই ভেবে মৃণাল থেকে বেরিয়ে যেই এসেছেন পাড়ে, অমনি গাছ থেকে নেমে এল ব্রহ্মহত্যা।

তাকে দেখেই তো ইন্দ্রের মুখ আবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন গুরুদেবের পা—গুরুদেব, বাঁচান। ব্রহ্মহত্যার হাত থেকে আমাকে বাঁচান গুরুদেব।

গুরুদেব যখন দয়া করেছেন, তখন আর কেউই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ব্রহ্মহত্যাও আর কিছু করতে না পেরে নিজের আগুনে নিজেই পুড়ে মরল।

এবার নিশ্চিন্তে দেবরাজ পুরন্দর ফিরে গেলেন স্বর্গরাজ্যে। গিয়ে দেখেন, অমন যে অমরাবতী, অমন যে প্রাসাদ, তার কি বিশ্রী দশা হয়েছে। অসুররা যা নয় তাই করে সব সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়ে গেছে। সেই প্রাসাদ, সেই বাগান, সেই কুঞ্জবন, সেই উপবন একেবারে তছনছ। এরকম পরিবেশে কি থাকা যায়? দেবরাজ বলে কথা। তাঁর উপযোগী প্রাসাদ, আমোদ-প্রমোদের উদ্যান, এসব না থাকলে কি দেবরাজের মর্যাদা থাকে?

ডেকে পাঠালেন দেব-স্থপতি বিশ্বকর্মাকে। আদেশ হল—মনোমত প্রাসাদ তৈরি করে দাও, যাতে আমি থাকতে পারি।

ইন্দ্রের আদেশ। বিশ্বকর্মাও লেগে পড়লেন কাজে। দিন-রাত পরিশ্রম করে সুন্দর এক প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। যেখানে যা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে তা সবই বানিয়ে দিলেন। কিন্তু দেখে পুরন্দরের মন ভরল না। বিশ্বকর্মাকে ডেকে খুব তিরস্কার করলেন তিনি। বললেন—এই

তোমার কাজ? যা-তা একটা করে দিলেই হল? শোন, বিশ্বকর্মা, যতদিন সব কিছু আমার ঠিক মনের মত না হবে, ততদিন আমি প্রাসাদেই ঢুকব না।

মহা-মুস্কিলে পড়লেন বিশ্বকর্মা। দেব-স্থপতি তিনি। যথেষ্ট সুনাম তাঁর। তাঁর যা বিদ্যে-বুদ্ধি ছিল, তাই দিয়ে আবার নতুন করে বানালেন সব কিছু। এবারও পুরন্দরের মনোমত হল না। তার পর থেকে যতবারই করেন, ততবারই পুরন্দর দেন বাতিল করে। বিশ্বকর্মারও ছুটি মেলে না, আবার দেবরাজের মনও পান না।

শেষে খুবই চিন্তায় পড়লেন বিশ্বকর্মা। আর কি ভাবে তিনি প্রাসাদকে সাজাবেন, যাতে পুরন্দরের মনে ধরে। আহার গেল, নিন্দ্রা গেল, বিশ্রাম গেল—চিন্তায় চিন্তায় আকুল হয়ে উঠলেন বিশ্বকর্মা। এ দিকে নিয়ত পুরন্দরের হুমকি। মনে মনে বিশ্বকর্মা ডাকেন ব্রহ্মাকে—ভগবান, আমার ছুটি কি মিলবে না?

দেখে-শুনে ব্রহ্মারও মনে কষ্ট হল। বৈকুণ্ঠে গিয়ে ব্রহ্মা বসলেন শ্রীহরির সঙ্গে যুক্তি করতে—বিশ্বকর্মা যে পুরন্দরের পাল্লায় পড়ে মরতে বসল। একটা উপায় তো করতে হয়।

শুনে শ্রীহরি বললেন—নিশ্চয়ই। দেবরাজ হয়ে এই ধরনের আবদার তো ঠিক নয়। আচ্ছা ব্রহ্মা, আমি দেখছি, তুমি যাও।

পুরন্দর স্বর্গলোকে দাঁড়িয়ে তদ্বির তদারক করছেন বিশ্বকর্মার কাজ। হঠাৎ দেখলেন সুন্দর দেখতে অল্পবয়সী এক কিশোর ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন সেখানে। পরনে সাদা পোশাক। কপালে চন্দনের তিলক, হাতে ছাতা-লাঠি।

কিশোর হলেও ব্রাহ্মণ দেখে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম জানালেন ইন্দ্র। যথোচিত সমাদরও করলেন। তার পর জিজ্ঞেস করলেন—বলুন ব্রাহ্মণ, কি মনে করে এখানে এসেছেন?

ব্রাহ্মণ কিশোর বললেন—শুনলাম বিশ্বকর্মা নাকি এক অত্যাশ্চর্য পুরী বানাচ্ছেন আপনার জন্য, তাই দেখার বড় ইচ্ছে হল। দেখতে এলাম।

—ওঃ, এই কথা। বেশ তো চলুন, ঘুরে ঘুরে দেখবেন। বলে পুরন্দর

তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন।

দেখার পর ব্রাহ্মণ বললেন—সত্যিই অপরূপ। আশ্চর্য। কোন ইন্দ্র যা পারে নি, তা তুমি করছ! তা পুরন্দর, কবে শেষ হবে?

ব্রাহ্মণ কিশোরের কথা শুনে মুচকি হাসলেন পুরন্দর। বললেন—ব্রাহ্মণ, তোমার বয়স তো দেখছি খুবই কম। তুমি যে বললে, কোন ইন্দ্র যা পারে নি, আমি তাই করছি—তা কজন ইন্দ্রকে তুমি দেখেছ?

পুরন্দরের কথায় মিটিমিটি হাসতে হাসতে ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন—পুরন্দর, তোমার বাবা তো কশ্যপ, তাই না? আর মরীচি? তিনি তো তোমার ঠাকুরদা, তাই না? তোমার ঠাকুরদার বাবা তো ব্রহ্মা, তাই তো? পুরন্দর, এঁদের সকলকেই আমি জানি। ব্রহ্মাকে যিনি রক্ষা করেন, সেই বিষ্ণু নারায়ণ, যাঁকে দেখবার জন্য তোমরা ছটফট কর, তাঁর সঙ্গে আবার আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

শুনতে শুনতে পুরন্দরের চোখ বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসে। মনে মনে ভাবেন, কেউ আবার ছলনা করতে এলেন না তো।

—তুমি প্রলয় দেখেছ পুরন্দর? আমি দেখেছি। প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি দেখেছ? দেখ নি তো! আমি কিন্তু দেখেছি। কতগুলো ব্রহ্মাণ্ড আছে জানো? জান না তো। আমি কিন্তু বিলক্ষণ জানি।

বলতে বলতে ব্রাহ্মণ হঠাৎ মুখ নিচু করে কি যেন দেখে হো ... হো করে হেসে উঠলেন। পুরন্দরও মুখ নিচু করে দেখলেন এক সার পিঁপড়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন—ব্রাহ্মণ, অমন করে হঠাৎ হেসে উঠলেন কেন ঐ পিঁপড়ের সারি দেখে?

—ঠিক ধরেছ পুরন্দর। বললেন ব্রাহ্মণ—ঐ পিঁপড়ের সারি দেখেই হাসি এল। জান, ওরা কারা? ওরা সকলেই এক সময় তোমারই মত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের ইন্দ্র ছিল। যেমন কর্ম করেছে এখন তেমনি তার ফল ভোগ করছে।

এবার আর পুরন্দর ঠিক থাকতে পারলেন না। দুই হাত জোড় করে হাঁটু মুড়ে কিশোর ব্রাহ্মণের সামনে বসে বলতে শুরু করলেন—আমাকে ছলনা করবেন না। দয়া করে বলুন আপনি কে। আপনিই কি সেই...

পুরন্দরের কথা শেষ হতে না হতেই সেখানে এসে হাজির হলেন এক বৃদ্ধ। নিঃসন্দেহে এক মহাযোগী। বুকে এক বুক লোম। তারই মাঝে আবার কিছু কিছু লোম টেনে তোলা।

ব্রাহ্মণবেশী ভগবান জিজ্ঞেস করলেন—কে আপনি? কি আপনার পরিচয়?

মহাযোগী বললেন—আমি লোমশ মুনি। শ্রীহরির দাস। জন্মবধি জানি, আমাদের পরমায়ু খুবই অল্প। তাই সংসার করি নি, ভিক্ষে করে দিন কাটাই। বিষয়-আশয় নিয়ে আমি আর নিজেকে জড়াতে চাই নি। এখানে এসেছি একবার ইন্দ্রকে দেখতে। এই যে ছেঁড়া লোম দেখছেন, যখনই এক জন করে ইন্দ্রের পতন হয়েছে, তখনই বুক থেকে আমার একটা করে লোম ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

বলে লোমশ মুনি আর অপেক্ষা না করে চলে গেলেন কৈলাসের দিকে।

লোমশ মুনির কথা শুনতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়েছিলেন পুরন্দর। তারপর আবার সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখেন, ব্রাহ্মণ কিশোরও আর নেই সেখানে।

জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল পুরন্দরের। বিশ্বকর্মাকে ডেকে তাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্তুষ্ট করে ছুটি দিলেন। সেই সঙ্গে নিজের ছেলেকে ডেকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেও ছুটি নিয়ে নিলেন।

মনে তাঁর তখন প্রচণ্ড ধিক্কার। ধিক্কার বিষয়-লালসার জন্য। ছিঃ ছিঃ, এতদিন কেন তিনি এটা বুঝতে পারেন নি যে, বিষয় কেবল লালসা বাড়ায়। লালসা থেকেই যত কিছু অপকর্ম। জীবনটা হয়ত সুখে কাটল, কিন্তু তারপর? ভেবে শিউরে উঠলেন পুরন্দর, পরের জন্মে পিঁপড়ে বা শূকর হয়ে জন্মাবেন না তো!

শ্রীকৃষ্ণ ও শৃগাল সংবাদ

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে বহাল তবিয়তে প্রায় রাজা হয়ে বসেছেন।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাজসভার নাম হল সুধর্মা।

একদিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বসে সুধর্মায়। এলেন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে দেখলেই মনে হয়, বেশ তেজস্বী।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যথোচিত সমাদর জানিয়ে বললেন—কোথা থেকে কি কারণে এখানে আসা হয়েছে ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ নর-রূপী সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেখিয়ে বললেন—আমার নিজের কোন কথা বলতে আসি নি। এক শৃগাল যা বলেছে, সেই কথাগুলোই আপনাকে শোনাতে এসেছি।

—শৃগাল? শৃগাল বলেছে? কৌতূহল দেখালেন শ্রীকৃষ্ণ।

—হ্যাঁ। এক শৃগালরাজ। সে বলছে, দ্বারকায় পুরী নির্মাণ করে যে বসুদেব-পুত্র বাসুদেব রয়েছেন, তিনি ভণ্ড, প্রতারক। সকলে তাঁকে ভগবান-জ্ঞানে পুজো করে ভুল করে। গোপের ছেলে সে, ভারি কুটিল। শঠতা করে দুর্বল রাজাদের মেরেছে, শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, নরককে মেরেছে। সে কি যুদ্ধ করেছে কারো সঙ্গে? কৌশলে খুন করেছে মাত্র। আর সেই খুনীকে কিনা সকলে পুজো করে! এই বলে একটু থেমে ব্রাহ্মণ আরও বললেন—শৃগালরাজা বলে বেড়াচ্ছে, সে-ই হল আসল বৈকুণ্ঠের অধিপতি স্বয়ং ভগবান। ত্রিভুবনে তার সমান আর কেউ নেই। সেই

জালিয়াত শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রমাণ নিতে আসে, আচ্ছা করে টের পাইয়ে দেবে। বলে থামলেন ব্রাহ্মণ।

শুনে সভায় যাঁরা ছিলেন, সকলেই তো প্রায় হই-হই করে উঠলেন। মুচকি মুচকি হাসলেন শ্রীকৃষ্ণ। তারপর বললেন—চল ব্রাহ্মণ, ঐ শৃগালরাজের সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসা যাক।

সকাল হতেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন শুনে শৃগালরাজও তার দলবল নিয়ে দাঁড়াল পথরোধ করে।

শ্রীকৃষ্ণ এসেই প্রথমে নিলেন তার কুশল-বার্তা। খুব কাছে এগিয়ে এল শৃগালরাজ। চুপি চুপি বলল—প্রভু, আপনি কি আমায় চিনতে পেরেছেন? আমি বৈকুণ্ঠে আপনার দ্বারী সুভদ্র। মা লক্ষ্মীর অভিশাপে শৃগাল হয়ে বড় কষ্টে রয়েছি। আপনার সুদর্শন চক্রে আমার এ জীবন শেষ করে দিন যাতে আমি আবার বৈকুণ্ঠে যেতে পারি।

শুনে কৃষ্ণের মনে দুঃখ হল। বললেন—তা সুভদ্র, তুমি আমার সম্বন্ধে অত সব কটূক্তি করেছ কেন?

শৃগালরাজ বলল—আপনার দেখা পাব বলে। যোগীরা সাধ্য-সাধনা করেও আপনার দেখা পায় না প্রভু। কটু কথা বলে রাগিয়ে তুলতে পেরেছে বলেই তো আপনি এলেন। এখন আমাকে দয়া করুন।

—আমি যে যুদ্ধ করতে এসেছি। আগে যুদ্ধে তোমার পরাক্রম দেখাও।

বাধ্য হয়েই শৃগালরাজকে অস্ত্র ধরতে হল। শুরু করতে হল সংগ্রাম। যে অস্ত্রই ছোঁড়ে শৃগালরাজ, সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। মুষল, পরশুবাণ–শৃগালরাজার সব অস্ত্র শেষ।

শেষে বলল—প্রভু, স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে কি অস্ত্র-যুদ্ধ সম্ভব? আপনি করুণাবতার। আমার কৃপা করুন। আমার এই জন্ম থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। বৈকুণ্ঠে আবার আমি যে আপনার দ্বারী সুভদ্র হয়ে থাকতে চাই।

শুনে শ্রীকৃষ্ণের বুক দুলে উঠল। চোখে এল ফোঁটা ফোঁটা জল। আহা, ভক্তের কি আকুতি!

মুক্তি পেল শৃগাল। দিব্যদেহ ধারণ করে সে আবার চলে গেল বৈকুণ্ঠে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু জলে তৈরি হয়ে গেল পবিত্র এক সরোবর—নাম বিন্দু-সরোবর।

দর্পহারী

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আর এক নাম হল—দর্পহারী ভগবান।

তাঁর প্রিয়জন যাঁরা, তাঁদের সকলেরই মনের অভিলাষ তিনি পূরণ করেন। অতুল শক্তি আর ঐশ্বর্য দিয়ে ভরিয়ে দেন তাঁদের। কিন্তু একটা জিনিস তিনি কোন মতেই সহ্য করতে পারেন না—তা হল অহঙ্কার, দর্প। শক্তি আছে বলেই যে তার নিয়ে অহঙ্কার করতে হবে, যাকে তাকে ক্ষমতা দেখিয়ে বাহবা কুড়াতে হবে, দর্পহারী ভগবান এটা কিন্তু আদৌ পছন্দ করেন না। শক্তিমান যদি সংযত হয়ে না রইল, যেখানে-সেখানে শক্তি ফলাতে লাগল, তাহলে কি বিশ্বের মঙ্গল হয়? না, নিজের ভাল হয়? তা কখনই হতে পারে না। তাই যখনই কেউ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে নিজেকেই সর্বশক্তিমান ভেবে কিছু করে বসে, দর্পহারী অলক্ষ্যে থেকে তাকে ঠিক উচিত শিক্ষা দিয়ে দেন।

ব্রহ্মা এবং শিব দুই জনেই তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান। দিন-রাত তাঁরই স্তব-স্তুতি, আরাধনা করে পেয়েছেন সেই অতুল শক্তি। ব্রহ্মা পেয়েছিলেন সৃষ্টির ক্ষমতা আর শিব পেয়েছিলেন সকলের মঙ্গল, সেই সঙ্গে সকলকে সংহার করার ক্ষমতা। এ কি কোন সামান্য ক্ষমতা? এই ক্ষমতা শিব পেয়েছিলেন বলেই সবাই তাঁকে পূজা করে, শ্রদ্ধা জানায়।

কিন্তু ক্ষমতার এমন মজা যে, তার স্রষ্টাকেই সে ভুলে যায়। আপনা থেকে কখন যে সে মত্ত হয়ে ওঠে, নিজেও টের পায় না। তা নইলে শিবের মত অত বড় মহাযোগীর এমন দুরবস্থা হবে কেন।

মহাযোগী শিব। এমনিতে তাঁর কোন অহঙ্কার নেই। কারো কাছে অযথা তিনি কখনো ক্ষমতা দেখিয়ে আস্ফালনও করেন না। কিন্তু ঐ যে

বললাম, কোন সুড়ঙ্গপথ ধরে ক্ষমতা যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, তার টের পাওয়া ভারি কঠিন। তার ফলে, এক সময় অমন যে শ্রীহরিভক্ত শিব, তিনিই-বা কেমন করে ভুলে গেলেন সব কিছু? নিজেকেই মনে করতে শুরু করলেন ঈশ্বর?

দর্পহারী ভগবানের চোখ তো আর এড়াবার নয়। লক্ষ্য তাঁর ঠিকই পড়েছে। শুধু অপেক্ষা করে আছেন, সুযোগ একবার আসুক, তারপর তাঁর প্রিয় ভক্ত পঞ্চাননকে আবার ঠিক করে দেবেন।

সেই সুযোগের জন্য দর্পহারীকে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না।

স্বর্গরাজ্যের অধিকার নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তখন টুকটাক যুদ্ধ লেগেই থাকত। দেবতারা এমনিতেই ভগবানের প্রিয়পাত্র। তাই তাঁদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হতো না অসুরদের। তাছাড়া দেবতারা আবার অমর।

অসুররাও কিন্তু কম যেত না। মাঝে মাঝে তারাও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের আরাধনা করে, তাদের তোয়াজ করে আদায় করে নিত মনের মত বর। আর সেই বরে বলীয়ান হয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ত স্বর্গরাজ্যে। ছারখার করে দিত সব কিছু। এমন আশ্চর্য যে, অসুররা যে বরই চাইত, তাদের তোয়াজে ভুলে গিয়ে, নিজেদের জাহির করার জন্য একেবারে অসম্ভব না হলে, দেবতারা তা দিয়ে দিতেন। তার জন্য পরে তাঁদের কম খেসারত দিতে হতো না। তবু ঐ যে, ক্ষমতা দেখানোর লোভ!

বৃক নামে এক অসুর একবার নির্জনে বসে শিবের আরাধনা শুরু করল। সে জানত, সবচেয়ে শিবের শক্তি বেশি। ইচ্ছে করলে তিনি অনেক কিছুই দিতে পারেন।

বৃকাসুরের খুব ইচ্ছা অমরত্ব বর আদায় করার। যদিও সে জানত ও বর মহাদেব তাকে কোন মতেই দেবেন না। যদি অমরত্ব একান্তই না দেন, তবে কিভাবে ঐ একই জিনিস আদায় করবে, মনে মনে বৃক তাও ঠিক করে শিবের আরাধনা করতে বসল।

পুরো এক বছর বৃক কঠোর তপস্যা করল।

কৈলাসে শিব আর চুপ করে থাকতে না পেরে সোজা এলেন বৃকাসুরের কাছে। বললেন—বৃক তোমার তপস্যায় আমি খুব খুশি হয়েছি। বল তোমার কি চাই? আমি দেব।

শিব এসেছেন। বর দিতে চাইছেন। শুনেও বৃক যেন শুনতে পেল না। আগের মতই চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল।

শিব আবার বললেন—বাবা বৃক, ওঠ। বর নাও

এবার চোখ খুলল বৃক। ভক্ত চোখ মেলে তাকিয়েছে দেখে মনে মনে খুবই খুশি হলেন শিব। আবার বললেন—বৃক, তোমার পুজোয় সত্যিই আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, কি তোমার চাই?

বৃক বলল—ঠাকুর, আমি যা চাইব, তা কি তুমি দিতে পারবে?

—কেন, পারব না কেন? বললেন শিব—শুধু অমরত্বটাই দিতে পারি না। তাছাড়া ত্রিভুবনে এমন কি আছে যে ঈশ্বর হয়ে আমি তা দিতে পারব না।

বৃক ভাল মানুষের মত বলল—না, না ঠাকুর। অমরত্ব নামে ঐ বাজে জিনিস আমি চাই না। আর তার জন্য আমি তপস্যাও করছি না।

—তাহলে তুমি কি চাইছ, বল?

—যা চাইব, তা ঠিক দেবে তো ঠাকুর।

—তুমি চাও। আমি নিশ্চয়ই দেব।

—তাহলে ঠাকুর, বলল বৃক—আমাকে এই বর দাও যে, আমি যার মাথায় হাত দেব, সে সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে যাবে।

—ওঃ! এই বর। তার জন্য এত তপস্যা? বললেন শিব—বেশ, আমি তোমাকে এই বরই দিলুম। তুমি যার মাথায় হাত দেবে সে তক্ষুণি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

দর্পহারী ভগবান শিবের কাণ্ড দেখে মনে মনে একচোট খুব হেসে নিলেন।

বর পেয়ে বৃক এবার দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের বুদ্ধিকে নিজেই একবার তারিফ করে নিল। অমরত্ব দেবে না? দেখ, ঘুরিয়ে কেমন ওটাই আদায় করলাম।

শিবও বর দিয়ে পিছু ফিরলেন খুশি মনে।

বৃকাসুর ডাকল—ও ঠাকুর।

ডাক শুনে থামলেন শিব। বললেন—কি বলছ বৃক? আর কিছু চাও নাকি?

বৃকাসুর বলল—না না, আর কিছুই চাই না। শুধু জিজ্ঞেস করছি, বরটা ঠিক দিয়েছ তো?

—কেন? ও কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? সন্দেহ হচ্ছে।

—সন্দেহ একটু হয় বৈকি। ভুলিয়ে দিয়ে চলে যাও। তারপর মরি আমরা।

—না বৃক, তুমি আমার ভক্ত। তোমাকে আমি ঠকাতে পারি? পরীক্ষা করে দেখো।

—এখানে এখন কার ওপর পরীক্ষা করে যাচাই করব ঠাকুর? আছ তো একমাত্র তুমি। তাহলে দাঁড়াও, তোমার ওপরেই যাচাইটা করে নিই। বলে শিবের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল বৃক।

ভয়ে দুরুদুরু করে উঠল শিবের বুক। সর্বনাশ!

—বৃক, আমি তোমাকে ঠকাই নি, বিশ্বাস কর। বলতে বলতে পিছু হাঁটেন শিব।

কিন্তু বৃক মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল, বর পেয়ে প্রথমেই এক হাত নেবে শিবের ওপর। তারপর একে একে সব কটাকে মেরে বসবে স্বর্গ-সিংহাসনে। তাই শিব যত পেছোন, বৃক তত এগিয়ে আসতে থাকে। বলে—পালাচ্ছ কেন, দাঁড়াও।

বেগতিক দেখে শিব এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেন। বিশাল শরীর নিয়ে দৌড়তে গিয়ে, শিবের কোমরের বাগছাল গেল খুলে। হাতের ডমরু, ত্রিশূল গেল হাত থেকে খসে। মাথার ওপর ভালভাবে জড়ানো জটা খুলে এলিয়ে পড়ল। কোন দিকে আর খেয়াল নেই তখন শিবের। প্রাণভয়ে পরিত্রাহি ছোটেন শিব, পেছনে ছুটে আসে বৃকাসুর।

ছুটতে ছুটতে প্রায় উলঙ্গ শিব ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে হাজির হলেন বৈকুণ্ঠে। সিংহাসনে বসে তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে শ্রীহরি নারায়ণ। শিব গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন সেখানে—ঠাকুর, বাঁচাও।

যদিও তিনি সবই জানেন, তবুও শিবের কাছ থেকে সব জেনে নিলেন। তারপর বললেন—থাক এখানে, দেখি কি করা যায়।

এই বলে, শ্রীহরি নারায়ণ নিলেন এক কৌশল।

বৈকুণ্ঠে ঢোকার মুখেই, এক বৃদ্ধার বেশ ধরে বসে রইলেন। বৃকাসুর কাছাকাছি আসতেই তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অমন করে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ গো তুমি?

বৃকাসুর বলল—শিব আমায় বর দিয়েছে, যার মাথায় হাত দেব, সে-ই ছাই হয়ে যাবে। তাই আগেই শিবকে ছাই করতে গেলাম, সে পালিয়ে এল এখানে।

শুনে হো হো হেসে উঠল বৃদ্ধা।

—তুমিও বিশ্বাস করে নিলে, মাথায় হাত দিলেই ছাই হয়ে যাবে? তা কখনো হয় নাকি?

—কেন হয় না? শিব বলে কথা। তার বর কখনো মিথ্যে হয় নাকি? বলল বৃক।

—সাধে কি তোমাদের বলে মাথামোটা অসুর? ওদের ছলচাতুরি যদি তোমরা বুঝতেই পারতে, তাহলে তোমরাই তো দেবতা হয়ে ত্রিলোক শাসন করতে। একেবারে ঠকিয়েছে তোমাকে। বিশ্বাস না হয়, নিজের মাথাতেই হাত দিয়ে দেখ না, কেমন ছাই হয়ে যাও। এতই সোজা!

বৃদ্ধার কথাগুলো শুনে এবার সত্যি সত্যিই বৃকাসুরের মনে কেমন সন্দেহ জাগল—সত্যি বলছ, আমায় ঠকিয়েছে? এ রকম হয় না?

—বললাম তো। মাথায় হাত দিলেই ছাই হয়ে যাওয়া এতই সোজা? কখনো তা হয় না। হাত দাও না নিজের মাথায়। তাহলেই বুঝতে পারবে, তোমায় শিব কেমন ঠকিয়েছে।

বৃকাসুরও আর আগুপিছু না ভেবে নিজের মাথাতেই নিজে হাত দিয়ে বসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছাই হয়ে গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শিব। মনে মনে খুব লজ্জাও পেলেন। বৈকুণ্ঠ থেকে কৈলাসে ফেরার পথে নিজের মনেই আওড়াতে লাগলেন—আর যদি কাউকে কখনো বর দিই! ভগবান শ্রীহরি দয়া না করলে আজ প্রাণটাই যেতে বসেছিল!

দর্পহারীর কাজও শেষ হল।

ধন্বন্তরি-মনসা সংবাদ

দেবতা ধন্বন্তরির অসীম দক্ষতা। হেন মন্ত্র-তন্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। অশ্বিনীকুমার দুই ভাই দেববৈদ্য, সুচিকিৎসক বলে সকলের কাছেই পরিচিত, সমাদরও তাঁর যথেষ্ট। ধন্বন্তরিও সেদিক থেকে আবার কিছু কম যান না।

স্বর্গরাজ্য ফিরে পাবার জন্য বিষ্ণুর নির্দেশে অসুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অমৃত খাইয়ে তাদেরও অমর করে দেবার লোভ দেখিয়ে দেবতারা যখন ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন, তখন এই ধন্বন্তরিই সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিলেন অমৃতের হাঁড়ি নিয়ে। ফলে দেব-সমাজে তাঁর কদরই আলাদা। কথায় বলে, ধন্বন্তরি। যত কঠিন আর দুরারোগ্য ব্যাধিই আসুক না কেন 'মার...মার' করে, একবার যদি ধন্বন্তরি তাকান তার দিকে, তখনই তার হাঁক-ডাক থেমে যাবে।

এহেন বেদবিদ্, চিকিৎসক, বৈদ্য ধন্বন্তরি। সুতরাং তাঁর মর্যাদা একটু আলাদা হবে বৈকি। অবশ্য এই গাছগাছড়া আর আয়ুর্বেদ বিদ্যেটা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বিনতার ছেলে, বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের কাছ থেকে। হাজার হাজার শিষ্য তাঁর।

একদিন শিষ্যদের নিয়ে ধন্বন্তরি চলেছেন মহা-সমারোহে কৈলাসের দিকে শিবের সঙ্গে দেখা করতে। হঠাৎ পথের মাঝে, তক্ষক সাপ কোথায় ছিল, তেড়ে এল ফোঁস...ফোঁস করে ফণা তুলে। তক্ষকের আস্ফালন দেখে থমকে দাঁড়ালেন ধন্বন্তরি। দাঁড়াল তাঁর শিষ্যরাও। তক্ষক কাছে আসতেই শিষ্যরা উঠল বিদ্রূপ করে—একে তো হিলহিলে সাপ, তার ওপর আবার তর্জন-গর্জন দেখ।

শুনে, রেগে তক্ষক ছোবল মেরে বিষ ঢালতে যাবে আর কি, একজন মাত্র শিষ্য খপ্ করে তাকে ধরে দিল বিষ দাঁত ভেঙ্গে। তারপর ঠাট্টা করে বলল—বড় আস্ফালন, না? এবার? যা। বলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

মাথা হেঁট করে তক্ষক ফিরে এল। নাগরাজ বাসুকির কানে খবর যেতেই সে তো গেল দারুণ রেগে। কি, এত বড় স্পর্ধা! তার দিগ্বিজয়ী ছেলের এই দুরবস্থা যারা করেছে, কোন মতেই তাদের ক্ষমা করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল আর সব বীর নাগদের। বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা।

ছুটে এল পুণ্ডরীক, দ্রোণ, ধনঞ্জয়, কর্কট, কালিয়া। সেই সঙ্গে এসে জড়ো হল হাজার হাজার বিষধর সাপ।

নাগরাজ হুকুম দিল—তক্ষকের এই অবস্থা যারা করেছে, তাদের কোন রেহাই নেই। যাও, তাদের সব খতম করে এস।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল নাগের দল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে। নিঃশ্বাসে তাদের বিষ ছড়িয়ে পড়তে লাগল বাতাসে। বাতাস হয়ে উঠতে লাগল মেঘের মত কালো আর ভারী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এসে ঘিরে ধরল ধন্বন্তরির শিষ্যদের।

পরিস্থিতি যে এখানে এসে দাঁড়াতে পারে, শিষ্যরা তা ভাবতেও পারে নি। সাপদের বিষ-নিঃশ্বাসে শিষ্যের দল লুটিয়ে পড়তে লাগল জ্ঞান হারিয়ে। ধন্বন্তরি দেখলেন, এ তো বেশ হল। কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া মাথায় উঠল। গুরুদেব গরুড়কে স্মরণ করে সঙ্গে সঙ্গে গাছ-গাছড়া দিয়ে ওষুধ তৈরি করে কোন রকমে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন শিষ্যদের। তারপর যত সাপ এসেছিল ফুস-মন্তর দিয়ে নিমেষে তাদের সব বিষহীন করে দিলেন। বিষ হারিয়ে মরে পড়ে রইল তারা যে যেখানে ছিল, সেভাবেই।

খবর গেল বাসুকির কাছে। মহা চিন্তায় পড়ল বাসুকি। শেষে কি ধন্বন্তরির হাতে নির্বংশ হতে হবে? এখন উপায়?

সর্বশাস্ত্রবিদ্, আস্তিক হল বাসুকির ভাগ্নে। জরৎকারু মুনির ছেলে। বাসুকির বোন মনসার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। মনসাকে ছেড়ে জরৎকারু

তপস্যা করতে চলে গেলে আস্তিককে দাদা বাসুকির কাছে রেখে মনসাও জপ-তপ করে খুবই শক্তিময়ী হয়ে উঠেছিল। মামাদের অবস্থা দেখে আস্তিকের মনে খুব কষ্ট হল। মামা বাসুকিকে বলল—মা, তুমি মাকে ডাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাসুকিও সঙ্গে সঙ্গে মনসাকে স্মরণ করতেই এসে হাজির হলেন মনসা। তাড়াতাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, বাঁচিয়ে তুললেন নিজের শক্তি দিয়ে ভাইদের আর তাদের ছেলেদের। তারপর এমন এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানলেন, যে শিষ্যরা আবার সবাই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

তারপর ধন্বন্তরিকে উপহাস করে মনসা বললেন—আমি জানি তুমি গরুড়ের শিষ্য। বড় দম্ভ তোমার। মনে করেছ তুমি সব কিছু শিখে ফেলেছ, জেনে ফেলেছ। আমাদের গুরু হলেন শিব। তোমার কত জারিজুরি আছে, এবার দেখাও।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন ধন্বন্তরি।

মনসাদেবী ইতিমধ্যে সরোবর থেকে একটা পদ্ম তুলে, তাতে মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে দিলেন ধন্বন্তরির দিকে। ধন্বন্তরি দেখলেন, যেন একটা হিলহিলে আগুন ছুটে আসছে তাঁর দিকে। মুহূর্তে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সেটাকে ঠেকালেন তিনি। তারপর মনসাদেবী বিষধর এক সাপকে আরো বিষধর করে ছুঁড়ে দিলেন ধন্বন্তরির দিকে, তাকেও আটকালেন তিনি। এরপর মনসা ধন্বন্তরিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে বসলেন হঠাৎ এক শক্তি (অস্ত্র)। জ্বলন্ত সেই শক্তিকে ছুটে আসতে দেখে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ধন্বন্তরিও তাকে দুর্বল করে দিলেন বিষ্ণুশক্তি দিয়ে। অমন শক্তিকে নিষ্ফল হতে দেখে মনসাদেবী ছুঁড়লেন নাগপাশ। হাজার হাজার নাগ এসে তখন ধন্বন্তরিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে, একেবারে অসহায় করে দিল। দেখে হো হো করে মনসাদেবী হেসে উঠে বললেন—কি হল ধন্বন্তরি? এবার বাঁচাও নিজেকে।

মৃত্যু অবধারিত জেনে ধন্বন্তরি তখন একমনে স্মরণ করতে লাগলেন গুরুদেব গরুড়কে। ডাক শুনে নিমেষের মধ্যে বাতাসে ঝড় তুলে গরুড় এসে হাজির হলেন সেখানে। তাঁকে দেখামাত্রই ভয়ে সাপেরা ধন্বন্তরির বাঁধন আলগা করে প্রাণ নিয়ে পালাতে উদ্যত হল, আর গরুড়ও মহানন্দে

টপাটপ করে ধরে মুখে পুরতে লাগলেন তাদের। কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় গেল শাপ, কোথায় গেল নাগের দল।

দেখে মনসার মাথা গেল গরম হয়ে।

আর যুদ্ধ-টুদ্ধ নয়, ধন্বন্তরিকে এবার উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

মনসাদেবী হাতে তুলে নিলেন শিবের অব্যর্থ শূল।

ধন্বন্তরির দিকে শূল তুলতে দেখেই সেখানে ছুটে এলেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর শিব।

এতক্ষণ তাঁরা আড়ালেই ছিলেন। দেখছিলেন রগড়। এবার দেখলেন মনসা যদি ঐ শূল একবার ছোঁড়েন, ধন্বন্তরি কেন, ত্রিভুবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হঠাৎ শিব আর ব্রহ্মাকে দেখে শূল ছোঁড়া বন্ধ রেখে মনসা তাঁদের প্রণাম জানালেন। ধন্বন্তরিও স্তব-স্তুতি করলেন তাঁদের।

ব্রহ্মা দুই জনকেই আশীর্বাদ জানিয়ে ধন্বন্তরিকে বললেন—ধন্বন্তরি, কেন মিছিমিছি মনসার সাথে বিবাদ করে নিজের শক্তি ক্ষয় করছ? তুমিও যেমন শক্তিমান, আমাদের মা মনসাও তেমন শক্তিময়ী। জরৎকারু মুনির পত্নী মনসা তপস্যা করে যে শক্তি অর্জন করেছে, তুমি ওকে সন্তুষ্ট রাখলে উপকারই পাবে। তাতে সকলের মঙ্গল হবে। মিছিমিছি এই ঝগড়া থামিয়ে, মনসাকে মা-এর মত মনে কর, পুজো কর। তাতে তোমার মঙ্গলই হবে।

ব্রহ্মার নির্দেশ অবশ্য ধন্বন্তরি অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। মনসাদেবীও সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। নাগলোকের সঙ্গে বাসুকিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।